## লেখক পরিচিতি

সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ চট্টগ্রাম জেলার এক সম্ভ্রান্তও শিক্ষিত পরিবারে জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁর পিতা সৈয়দ আহম্মদউল্লাহ ছিলেন উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মকর্তা। ময়মনসিংহ অতিরিক্ত জেলা প্রশাসকের চাকুরিতে নিযুক্ত থাকার সময় তিনি পরলোক গমন করেন। সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ অল্প বয়সেই মাতৃহীন হন। ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট পিতার বিভিন্ন কর্মস্থলে তাঁর স্কুল শিক্ষা সম্পন্ন হয়। ১৯৪৩ সালে তিনি আনন্দমোহন কলেজ থেকে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক হন। তারপর কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে এম.এ পড়ার জন্য ভর্তি হন। কিন্তু এম এ ডিগ্রী নেওয়ার আগেই ১৯৪৫ সালে তিনি বিখ্যাত ইংরেজি দৈনিক পত্রিকা 'দি স্টেট্স্ম্যান' এর সাংবাদিক হন এবং সাংবাদিকতার সূত্রেই কলিকাতার সাহিত্যিক মহলে পরিচিত হয়ে ওঠেন। তখন থেকেই বিভিন্ন পত্র পত্রিকায় তাঁর রচনা প্রকাশিত হতে থাকে। ১৯৪৭ সালে পাকিস্তান হওয়ার পর তিনি ঢাকায় এসে বেতার কেন্দ্রে সাংবাদিক হিসেবে যোগদান করেন। ১৯৫০ এ তিনি করাচী বেতারে বার্তা সম্পাদক হন এবং তারপর তিনি কূটনৈতিক দায়িত্বে নিয়োজিত হন। প্রথমে নয়াদিল্লীতে তারপর ক্রমান্বয়ে ঢাকা, সিডনী, করাচী জাকার্তা, বন, লন্ডন এবং প্যারিসে তিনি চাকরি করেন। তাঁর শেষ কর্মস্থল প্যারিস। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ সমর্থন করার জন্য তিনি পাকিস্তান সরকারের চাকরি ত্যাগ করেন এবং মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে কাজ শুরু করেন। দেশ স্বাধীন হওয়ার পূর্বেই ১৯৭১ সালের অক্টোবরে তিনি প্যারিসে পরলোক গমন করেন।

রচিত গ্রন্থের সংখ্যা কম হলেও সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহর সাহিত্যকর্ম সমগ্র বাংলা সাহিত্যে বিশেষ মর্যাদার অধিকারী। বিশেষত তাঁর গল্প এবং উপন্যাসে ব্যক্তি ও সমাজ জীবনের বহির্লোক এবং অন্তর্লোকের যে সূক্ষ্ম ও গভীর রহস্য উদ্ঘাটন করেছেন তার তুলনা বাংলা সাহিত্যে বিরল। কুসংস্কার ও অন্ধ ধর্মবিশ্বাসে আচ্ছন্ন, বিপর্যস্ত, আশাহীন ও মৃতপ্রায় সমাজ জীবনের চিত্র যেমন এঁকেছেন একদিকে, তেমনি অন্যদিকে মানুষের মনের ভেতরকার লোভ, প্রতারণা, ভীতি, ঈর্ষা প্রভৃতি প্রবৃত্তির ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া বিজ্ঞানীর মতোই উদ্ঘাটিত করেছেন। শুধু উপভোগ্য মজাদার গল্প রচনা তাঁর অভীষ্ট কখনোই ছিল না। তিনি মানব জীবনের মৌলিক সমস্যাগুলিকে পাঠকের সামনে তুলে ধরেছেন।

তাঁর গল্পগ্রন্থ 'নয়ন চারা' ও 'দুই তীর' প্রকাশিত হয় যথাক্রমে ১৯৪৬ ও ১৯৬৫ সালে এবং উপন্যাস 'লালসালু' 'চাঁদের অমাবস্যা' ও কাঁদো নদী কাঁদো'র প্রকাশ কাল যথাক্রমে ১৯৪৮, ১৯৬৪ ও ১৯৬৮ সালে। সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ নিরীক্ষামূলক তিনখানি নাটকও লিখেছেন। সেগুলি হল 'বহিপীর, তরঙ্গভঙ্গ ও সুড়ঙ্গ।

# লালসালু ঃ সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ

### ভূমিকা

*সমগ্র বাংলা সাহিত্য 'লাল সালু' একটি উল্লেখযোগ্য উপন্যাস। এ উপন্যাস সম্পর্কে পর্ণাঙ্গ ধারণা লাভের জন্য উপন্যাসের সংজ্ঞা, গঠনকৌশল, উদ্ভব ও বিকাশ এবং বাংলা ভাষায় লিখিত উপন্যাস সাহিত্য সম্পর্কে শিক্ষার্থীর জ্ঞান থাকা আবশ্যক। তাছাড়া ঔপন্যাসিক সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ'র অবদান এবং উপন্যাস হিসাবে 'লালসালু' কতখানি সার্থক তা জানা শিক্ষার্থীর প্রয়োজন।*

## পাঠ ১

### উদ্দেশ্য

**এ পাঠটি পড়ে আপনি–**

- উপন্যাসের শব্দগত অর্থ এবং তার সংজ্ঞা বা উপন্যাস কাকে বলে তা বর্ণনা করতে পারবেন।
- কোন সব উপাদান দিয়ে উপন্যাসের শিল্পরূপটি তৈরি হয়, সে সম্পর্কে আপনি একটি অনুচ্ছেদ লিখতে পারবেন।

কবিতা, গীতিকাব্য, মহাকাব্য, নাটক, ছোটগল্প ইত্যাদির মতো উপন্যাসও সাহিত্যের একটি বিশিষ্ট শিল্পরূপ।

উপন্যাস শব্দের ব্যাকরণগত ব্যুৎপত্তি এ রকম– 'উপ' ও 'নি' পর্বক অস্ ধাতুর সঙ্গে অ(ঘঞ) প্রত্যয় যুক্ত হয়ে উপন্যাস শব্দ তৈরি হয়েছে। এর শব্দগত অর্থ হচ্ছে, উপযুক্ত বা বিশেষ রূপে ন্যাস বা স্থাপন। অর্থাৎ উপন্যাস এমন এক কাহিনী যা বিশেষ কৌশলে উপস্থাপন করা হয়। বাংলা উপন্যাস শব্দের ইংরেজি প্রতিশব্দ Novel এর আভিধানিক অর্থ হচ্ছে, a fictitious prose narrative or tale presenting picture of real life of the men and women portrayed–অর্থাৎ উপন্যাস হচ্ছে গদ্যে লিখিত সেই রকম এক বর্ণনা বা কাহিনী যার মধ্যে বর্ণিত মানব-মানবীর জীবন যাপনের বাস্তবতা প্রতিফলিত হয়ে থাকে।

ব্যুৎপত্তিগত এবং আভিধানিক অর্থ বিশ্লেষণ করলে আমরা উপন্যাসের সংজ্ঞা পেয়ে যাই। আমরা বুঝতে পারি যে, মানব-মানবীর জীবন যাপনের বাস্তবতা অবলম্বনে যে কল্পিত উপাখ্যান পাঠকের কাছে আকর্ষণীয় করার জন্য বিশেষভাবে বিন্যস্ত করে গদ্যে লিপিবদ্ধ হয় তাকেই উপন্যাস বলা যায়। যেহেতু মানব-মানবীর জীবন যাপনের বিষয়টি উপন্যাসে প্রধান, সেহেতু উপন্যাসের কাহিনী যেমন বিশ্লেষণাত্মক হয়, তেমনই তা হয় দীর্ঘ। বিখ্যাত ইংরেজ ঔপন্যাসিক E.M. Forster মনে করেন, কমপক্ষে ৫০ হাজার শব্দ দিয়ে উপন্যাস রচিত হওয়া উচিত।

উল্লিখিত সংজ্ঞার মধ্যেই আমরা উপন্যাসের উপাদানগুলির সন্ধান পেয়ে যাই। যেমন –

১. উপন্যাসে একটি দীর্ঘ কাহিনী থাকা প্রয়োজন। তবে কাহিনী মাত্রই উপন্যাস হয় না। মানব-মানবীর অর্থাৎ ব্যক্তির সুখ-দুঃখ, সাধ, ঘৃণা, হিংসা, ভালোবাসা ঐ কাহিনীতে প্রাধান্য লাভ করে। দেবতা, ভূতপ্রেত, জন্তু, জানোয়ারের কাহিনী তো নয়ই এমন কি যে কাহিনীতে কেবল রাজার ঐশ্বর্য ও ক্ষমতার দাপট কিংবা পুরোহিতের অনুশাসন প্রধান হয়ে ওঠে, ব্যক্তি মানুষের ঘাত সংঘাতময় জীবনের কিংবা তার আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রাধান্য থাকে না, তেমন কাহিনীকে উপন্যাস বলা যায় না।

২. ব্যক্তির সঙ্গে ব্যক্তি কিংবা সমাজের সম্পর্কজাত বাস্তব ঘটনাবলী ও ঘাত সংঘাতই যেহেতু উপন্যাসের কাহিনী নির্মাণ করে সেহেতু ব্যক্তির আচরণ এবং ক্রিয়াকাণ্ডই হয়ে যায় উপন্যাসের প্রধান বর্ণনার বিষয়। উপন্যাসের এ ব্যক্তিকেই বলা হয় চরিত্র বা Character.

৩. উপন্যাসের কাহিনীতে Plot বা সুপরিকল্পিত একটি বিষয় থাকা প্রয়োজন। অর্থাৎ ঘটনা ও চরিত্রের ক্রিয়াকাণ্ডকে এমনভাবে বিন্যস্ত করা হয় যাতে তা বাস্তব জীবনকে তো প্রতিফলিত করেই, উপরন্তু তা কাহিনীর আকর্ষণীয়, আনন্দদায়ক ও বাস্তব পরিণতি সম্পাদন করে থাকে।

৪. মানুষ দৈনন্দিন জীবনে যে ভঙ্গির ভাষা ব্যবহার করে, সেই ভঙ্গির ভাষা অর্থাৎ গদ্যভাষাতেই উপন্যাস লিপিবদ্ধ হয়ে থাকে।

৫. উপন্যাসের মধ্যদিয়ে মানবজীবন সংক্রান্ত কোন সত্যের উদ্‌ঘাটন অথবা উদ্ভাবন ঘটানো হয়ে থাকে। তাই সার্থক উপন্যাস পাঠ করলে পাঠক মানবজীবন সংক্রান্ত কোন সত্যকে গভীরভাবে উপলব্ধি করতে পারেন। এ ভাবেই উপন্যাস শিল্প মানুষের মন ও মননকে প্রসারিত গভীরতা-স্পর্শী করে তোলে।

## পাঠোত্তর মূল্যায়ন

১. উপন্যাস শব্দের অর্থ কী?

২. উপন্যাস কাকে বলে?

৩. কোন সব উপাদান দিয়ে উপন্যাসের শিল্পরূপ নির্মিত হয় উল্লেখ কর।

# পাঠ ২

**উদ্দেশ্য**

**এ পাঠটি পড়ে আপনি–**

- উপন্যাসের উদ্ভব ও বিকাশ সম্পর্কে একটি বর্ণনা লিখতে পারবেন।

মানুষের গল্প শোনার আগ্রহ থেকেই কাহিনীর উদ্ভব। প্রাগৈতিহাসিক কাল থেকেই মানুষের এ আগ্রহ সৃষ্টি হয়েছে বলে পণ্ডিতেরা অনুমান করেন। প্রাগৈতিহাসিক গুহাচিত্র দেখে তাঁদের এ অনুমান। পরে প্রাকৃতিক শক্তির প্রতীক হিসেবে দেবদেবী কল্পিত ও প্রতিষ্ঠিত হলে প্রথমে দেবদেবী ও পরে পুরোহিত, গোষ্ঠিপতি ও রাজাদের কীর্তিকাণ্ড কাহিনীর বিষয় হয়ে ওঠে। লিপির উদ্ভাবন ও ব্যবহার শুরু হতে হতে বহু শতাব্দী গত হয়। ততদিনে মানবসমাজে সম্রাট, পুরোহিত ও ভূ-স্বামীদের সর্বময় কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। ফলে দেবতা ও রাজার কাহিনীই লিপিবদ্ধ হয় ছন্দোবদ্ধ অলঙ্কৃত ভাষায়। এ ভাবেই নাটক, কাব্য ও মহাকাব্যের সৃষ্টি। মানুষের দৈনন্দিন জীবন যাপনের ভাষা গদ্যে কাহিনী লেখা হয়েছে অনেক পরে। মুখে মুখে রচিত কাহিনী যেমন রূপকথা, উপকথা, পুরাণ, জাতকের গল্প ইত্যাদি গদ্যে লিপিবদ্ধ হয় প্রাচীন কালেই। কিন্তু মানুষ এবং মানুষের জীবন ঐসব কাহিনীর বিষয় হতে পারে না, পাত্রপাত্রী মানুষ থাকলেও প্রাধান্য থাকে হুর, পরি, জীন, ভূত, প্রেত দেবদেবী ইত্যাদির। কারণ সমাজে ব্যক্তি মানুষের অধিকার স্বীকৃত না থাকায় ব্যক্তিরও কাহিনীতে প্রাধান্য লাভের উপায় ছিল না।

ইউরোপে মধ্যযুগের অবসানে বাণিজ্য পুঁজির বিকাশ আরম্ভ হয়। ১৪শ শতাব্দীতে শুরু হয় ইয়োরোপীয় নবজাগরণ বা রেনেঁসা। অজ্ঞতা, কুসংস্কার পরিহার করে জ্ঞান ও মুক্তবুদ্ধির চর্চা, বিজ্ঞান ও যুক্তিনির্ভরতা এবং মানবতাবাদের প্রতিষ্ঠা এ সবই হয়ে ওঠে শিক্ষিত সমাজের জীবনযাপনের অঙ্গ। একই সময়ে বাণিজ্য পুঁজির বিকাশ আরম্ভ হলে সমাজে বণিক শ্রেণীর গুরুত্ব বৃদ্ধি পায় এবং রাজা, সামন্তভূস্বামী এবং পুরোহিতদের সামাজিক গুরুত্ব হ্রাস পেতে থাকে। এ পরিমণ্ডলে ভাগ্য ও ঈশ্বরনির্ভরতা পরিহার করে মানুষ হয়ে ওঠে স্বাবলম্বী, অধিকার সচেতন এবং অধিকার প্রতিষ্ঠায় উন্মুখ। এরই ফলে ফ্রান্সে ১৭৮৯ সালের গণবিপ্লবে রাজতন্ত্র উচ্ছেদ হয়ে যায়। এর আগে আমেরিকার মানুষ ব্রিটিশ শাসন মুক্ত হয়ে স্বাধীনতা অর্জন করে। এ দুটি ঘটনা মানবাধিকার প্রতিষ্ঠা ও গণতন্ত্রের পথ খুলে দেয়। সমাজে ব্যক্তিমানুষ হয়ে উঠে সবিশেষ গুরুত্বপর্ণ এবং ব্যক্তির জীবনই হয়ে ওঠে সাহিত্যের প্রধান বিষয়। এ ভাবেই সমাজ পরিবর্তন ও ব্যক্তির অধিকার প্রতিষ্ঠার প্রয়াসের পটভূমিকাতেই উপন্যাস-এর উদ্ভব ও বিকাশ।

গদ্যে রচিত দীর্ঘ ও ধারাবাহিক কাহিনী 'আলিফ লায়লা ওয়া লায়লা' রচিত হয় আরবি ভাষায়, বাগদাদে আব্বাসীয় খলিফাদের শাসনামলে। ইয়োরোপে রেনেসাঁর প্রথম দিকে ইটালির লেখক বোকাচ্চিও লেখেন ডেকামেরন গল্পমালা। ১৭শ শতকের সূচনায় স্পেনের লেখক সারভেন্তেস লেখেন ডন কুইকজোট (Don Quixote) নামক কাহিনীগ্রন্থ। সময়ের দীর্ঘ ব্যবধান থাকলেও এ দুই রচনাতেই ব্যক্তির জীবন, তার অভিজ্ঞতা, তার আশা-হতাশাই ফুটিয়ে তোলা হয়েছে গভীর বিশ্বস্ততার সঙ্গে। পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ উপন্যাসগুলির অধিকাংশই লেখা হয়ে যায় উনিশ শতকের মধ্যে। ফরাসী, ইংরেজি ও রুশ ভাষায় লেখা উপন্যাসসমূহ যেমন ফ্রান্সের স্তাঁধাল ও এমিলিজোলার 'স্কারলেট এ্যান্ড ব্ল্যাক' এবং 'দি জারমিনাল', বৃটেনের হেনরি ফিল্ডিং ও চার্লস ডিকেন্সের 'টম জোন্স' এবং 'এ টেল অফ টু সিটিজ' রাশিয়ার লিওতলস্তয় ও ফিয়োদর দস্তয় ভস্কির 'ওয়ার এ্যান্ড পীস' এবং 'ক্রাইম এ্যান্ড পানিশমেন্ট' উপন্যাস শিল্পকে বিকাশের চূড়ান্ত স্তরে পৌঁছে দিয়েছে। এ সব মহৎ উপন্যাস পাঠকের মনকে বৃহত্তর জগৎ ও জীবনের সঙ্গে যুক্ত করে দেয়।

## পাঠোত্তর মূল্যায়ন

১. উপন্যাসের উদ্ভব সম্পর্কে যা জানলেন সংক্ষেপে লিখুন।

২. সমাজ বিকাশের কোন স্তরে উপন্যাসের আবির্ভাব, উল্লেখ করুন– তার আগে কেন উপন্যাস লেখা হতো না?

৩. কালজয়ী কয়েকখানি উপন্যাসের এবং তার লেখকের নাম উল্লেখ করুন।

# পাঠ ৩

**উদ্দেশ্য**

**এ পাঠটি পড়ে আপনি–**

- বিষয় ও আঙ্গিক ভেদে উপন্যাস কত প্রকার হতে পারে তা বর্ণনা করতে পারবেন।

বিষয়, চরিত্র এবং আঙ্গিকের ভিত্তিতে উপন্যাসকে কয়েক শ্রেণীতে ভাগ করা যেতে পারে। যেমন-

**১. সামাজিক উপন্যাস ঃ** যে উপন্যাসে সামাজিক বিষয়াদি প্রাধান্য লাভ করে, তাকে সামাজিক উপন্যাস বলা হয়। সামাজিক রীতিনীতির সঙ্গে ব্যক্তি মানুষের দ্বন্দ্বের কাহিনীই প্রধান হয়ে থাকে এ জাতীয় উপন্যাসে। যেমন- রবীন্দ্রনাথের 'চোখের বালি' কিংবা শরৎচন্দ্রের 'গৃহদাহ'। নজিবর রহমানের 'আনোয়ারা' সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহর 'লালসালু'ও সামাজিক উপন্যাস।

**২। ঐতিহাসিক উপন্যাস ঃ** ইতিহাসের কোন পর্বের গুরুত্বপর্ণ ঘটনা এবং সংশ্লিষ্ট ঐতিহাসিক চরিত্র অবলম্বনে লিখিত উপন্যাসকে ঐতিহাসিক উপন্যাস বলা হয়। ঐতিহাসিক উপন্যাসে লেখকের কল্পিত ঘটনা বা চরিত্র সৃষ্টির অবকাশ আছে। কিন্তু এসব চরিত্র বা ঘটনার মাধ্যমে প্রচলিত ঐতিহাসিক সত্য থেকে লেখক বিচ্যুত হতে পারেন না। বঙ্কিমচন্দ্রের 'রাজসিংহ' রাখাল দাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'ধর্মপাল', ঐতিহাসিক উপন্যাস বলে বিবেচিত। রুশ ভাষায় লিখিত তলস্তয়ের কালজয়ী গ্রন্থ 'ওয়ার এ্যান্ড পীস, একখানি ঐতিহাসিক উপন্যাস।

**৩। মনস্তাত্ত্বিক উপন্যাস ঃ** যে উপন্যাসে পাত্র-পাত্রীর মনোজগতের ঘাতসংঘাত ও ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া প্রধান হয়ে ওঠে, তাকে মনস্তাত্ত্বিক উপন্যাস বলা হয়। অবশ্য সামাজিক উপন্যাস যেমন মনস্তাত্ত্বিক ঘাত সংঘাত থাকতে পারে, তেমনি মনস্তাত্ত্বিক উপন্যাসেও সামাজিক ঘাত-সংঘাত থাকতে পারে। ফরাসী লেখক গুস্তভ ফ্লভেয়ার লিখিত 'মাদাম বোভারি', দস্তয়ভস্কি লিখিত 'ক্রাইম এ্যান্ড পানিশমেন্ট' এবং রবীন্দ্রনাথের 'ঘরে বাইরে', মনস্তাত্ত্বিক উপন্যাসের উজ্জ্বল উদাহরণ।

**৪। রাজনৈতিক উপন্যাস ঃ** যে উপন্যাসে রাজনৈতিক ঘটনাবলী এবং রাজনীতির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট চরিত্রের কর্মকাণ্ড প্রাধান্য লাভ করে তাকে রাজনৈতিক উপন্যাস বলে। যেমন গোপাল হালদারের 'ত্রয়ী' উপন্যাস 'একদা', অন্যদিন', 'আর একদিন' এবং সতীনাথ ভাদুড়ির 'জাগরী'।

**৫। আঞ্চলিক উপন্যাস ঃ** কোন বিশেষ অঞ্চলের মানুষ এবং জীবন নিয়ে যে উপন্যাস লেখা হয় তাকে আঞ্চলিক উপন্যাস বলা হয়। যেমন তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'হাঁসুলি বাঁকের উপকথা', এবং অদ্বৈত মল্ল বর্মনের 'তিতাস একটি নদীর নাম'।

**৬। রহস্যোপন্যাস ঃ** যে উপন্যাসের গল্প রহস্যময়তা সৃষ্টি করা হয় তেমন উপন্যাসকে রহস্যোপন্যাস বলা হয়। দীনেন্দ্র কুমার রায়, হেমেন্দ্র কুমার রায়, সত্যজিৎ রায় প্রমুখ লেখক বাংলা ভাষায় বহু রহস্যোপন্যাস লিখেছেন।

এ ছাড়া বৈশিষ্ট্যের দিক থেকেও উপন্যাসের শ্রেণী বিভাগ করা যায়। যেমন ইংরেজ লেখক জর্জ অরওয়েল মানুষের বদলে জন্তু জানোয়ারকে পাত্রপাত্রী করে লিখেছেন রূপক উপন্যাস 'এ্যানিমেল ফার্ম'। মানুষের মনোলোকে বর্তমানের অভিজ্ঞতা, অতীতের স্মৃতি এবং ভবিষ্যতের কল্পনা এক সঙ্গে প্রবাহিত হয়। এই প্রবাহের ভাষিক বর্ণনা দিয়ে চেতনা প্রবাহমূলক উপন্যাস লিখিত হয়। আইরিশ লেখক জেম্‌স জয়েসের বিখ্যাত গ্রন্থ 'ইউলিসিস' এমনই একখানি উপন্যাস। সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ রচিত 'চাঁদের অমাবস্যা'কেও চেতনা প্রবাহমূলক উপন্যাস বলা হয়।

## পাঠোত্তর মূল্যায়ন

১. উপন্যাসের শ্রেণীবিভাগ কিভাবে করা যায়?
২. বিষয় ভিত্তিক উপন্যাস কয় প্রকার এবং কী কী
৩. আঙ্গিক ভিত্তিক উপন্যাস কয় প্রকার ও কী কী?

# পাঠ ৪

**উদ্দেশ্য**

**এ পাঠটি পড়ে আপনি–**

- বাংলা ভাষায় লিখিত উপন্যাস সাহিত্য সম্পর্কে একটি বর্ণনা লিপিবদ্ধ করতে পারবেন।

বাংলা ভাষায় উপন্যাস লেখার সূচনা আধুনিক কালে। আমরা জানি গদ্যই হল উপন্যাসের একমাত্র প্রকাশ মাধ্যম। সুতরাং গদ্য সৃষ্টি না হলে উপন্যাস রচনার প্রশ্নই ওঠে না। ১৮০০ খ্রিস্টাব্দে কলিকাতায় ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ প্রতিষ্ঠা হয়। এ কলেজে ইংরেজ সিভিলিয়ানদের বাংলা ভাষা শেখানোর ব্যবস্থা করা হয় এবং সেই ব্যবস্থানুযায়ী বাংলা গদ্য লিখিত হয়। ঐ সময় থেকেই সামাজিক জীবনের জটিলতা ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণের কাজে গদ্যের ব্যবহার শুরু হয়। এক্ষেত্রে সংবাদপত্রের ভূমিকা বিশেষভাবে স্মরণীয়। তবে গদ্যের সাহিত্য রচনার উপযোগী হয়ে উঠতে বেশ সময় লাগে। ১৮৫৮ সালে প্রকাশিত প্যারিচাঁদ মিত্রের লিখিত "আলালের ঘরের দুলাল" নামক কাহিনীগ্রন্থে আধুনিক উপন্যাসের লক্ষণ অর্থাৎ জীবন যাপনের বাস্তবতা, ব্যক্তিচরিত্রের বিকাশ এবং মানবিক কাহিনী সুস্পষ্টভাবে দৃষ্টিগোচর হয়। বাংলা সাহিত্যে সুন্দর গদ্যে উপভোগ্য সঠিক কাহিনীসমৃদ্ধ সার্থক উপন্যাস লেখেন বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। তাঁর প্রথম উপন্যাস 'দুর্গেশনন্দিনী' একটি সার্থক রচনা। প্লট বা কাহিনীর যথার্থবিন্যাস এবং চরিত্রসৃষ্টিসহ উপন্যাস রচনার আঙ্গিক সম্পর্কে সচেতন হয়ে বক্তব্য সমন্বিত ব্যক্তি-মানুষের কাহিনী তিনিই প্রথম যথার্থ গদ্য ভাষায় লিপিবদ্ধ করেন।

তবে বঙ্কিমচন্দ্রের অধিকাংশ উপন্যাসেই দূর অতীতের কল্পনা বেশি– সমকালীন জীবন প্রায় অনুপস্থিত। কেবল 'বিষবৃক্ষ' ও 'কৃষ্ণকান্তের উইল' এ দুটি উপন্যাসে সমকালীন জীবন বাস্তবতা মোটামুটি স্পষ্টভাবে প্রতিফলিত হয়েছে। বিধবা রমনীর প্রণয় এবং বিবাহ সামাজিক ও পারিবারিক জীবনে কী রকমের জটিল সমস্যা এবং তীব্র সংকট সৃষ্টি করতে পারে তারই কাহিনী তিনি ঐ দুই উপন্যাসে লিপিবদ্ধ করেছেন। বলাবাহুল্য তাঁর বক্তব্যে বিধবা নারীর মানবিক অধিকার স্বীকৃত হয়নি। রক্ষণশীল দৃষ্টিভঙ্গি থাকা সত্ত্বেও বলতে হবে বঙ্কিমচন্দ্রই বাংলা উপন্যাসের বিকাশের পথটি খুলে দিয়েছেন। তারপরে রবীন্দ্রনাথ সামাজিক ও মনস্তাত্ত্বিক সংকটাপন্ন ব্যক্তিজীবনের কাহিনীগুলি রচনা করেন 'চোখের বালি' 'ঘরে বাইরে', 'যোগাযোগ' প্রভৃতি উপন্যাসে। বস্তুত রবীন্দ্রনাথই বাংলা উপন্যাসে প্রকৃত আধুনিক চিন্তা ভাবনার প্রসার ঘটান। উদার মানবতাবাদী জীবনাদর্শে বিশ্বাসী লেখকের দৃষ্টিতে বিধবার প্রণয় পাপকার্য বলে স্বীকৃত হয়নি এবং সেই কারণে প্রণয়িনী বিধবাকে প্রাণ দিয়ে ঐ পাপের প্রায়শ্চিত্তও করতে হয় নি। সংস্কার ধর্ম ও আদর্শের চাইতে মানুষের জীবন যে অনেক বেশি মূল্যবান– এ বিবেচনা রবীন্দ্রনাথের প্রায় সকল উপন্যাসেই উপস্থিত। 'গোরা', 'চার অধ্যায়' প্রভৃতি উপন্যাসে আবার ব্রিটিশ শাসন থেকে মুক্তির অভিপ্রায় ব্যক্ত হয়েছে। ব্যক্তি জীবনের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম অভিপ্রায় ও বাসনার প্রতিক্রিয়া যেমন ব্যক্ত হয়েছে তেমনই জগৎ ও বৃহত্তর জীবনের যাবতীয় প্রসঙ্গ রবীন্দ্রনাথের উপন্যাসের মধ্যে আমরা প্রতিফলিত হতে দেখি।

বর্তমান শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকের পরে বাংলা উপন্যাস অসাধারণ জনপ্রিয়তা অর্জন করে। এ ঘটনার কৃতিত্ব শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের। বাঙালি মধ্যবিত্ত ও নিম্নবিত্ত হিন্দু সমাজের গ্রামীণ সমাজের ও গার্হস্থ্য জীবনের সুখদুঃখের কাহিনী এমন অন্তরঙ্গ ভাষায় ও কৌশলে লিপিবদ্ধ করেছেন তিনি যার তুলনা বাংলা সাহিত্যে খুব কম। সামাজিক সংস্কারের পীড়নে নারীর অসহায়তার এমন করুণ চিত্রও আর কোন লেখক আঁকেন নি। একদিকে এ বাস্তবতা আর অন্যদিকে এ বাস্তবতা থেকে উদ্ভূত মানব মনের জটিল কুটিল ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া এ দুটি দিকই পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে ধারণ করে আছে তার 'গৃহদাহ', 'শ্রীকান্ত', 'চরিত্রহীন' প্রভৃতি উপন্যাস।

রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্রে যে সামাজিক বাস্তবতা প্রতিষ্ঠিত তা দ্রুত বদলে যাচ্ছিল। শিক্ষার প্রসার, বিশেষ করে নারী শিক্ষার প্রসার এবং অর্থনৈতিক সংকট একই সঙ্গে মানুষের পারিবারিক জীবনকে জটিল করে তুলছিল, এ এক দিক, আর অন্যদিকে বৃটিশ ঔপনিবেশিক শাসন বিরোধী আন্দোলনের ফলে সাধারণ মানুষ ক্রমেই হয়ে উঠছিল অধিকার সচেতন। এ নতুন সামাজিক বাস্তবতার মধ্যে সাহিত্য ক্ষেত্রে নতুন দিগন্ত সন্ধানের তীব্র আকাঙ্ক্ষা নবীন লেখকদের

একদিকে মানুষের মনোলোকের জটিল রহস্য সন্ধানে আগ্রহী করে তোলে, আবার অন্যদিকে তাঁদের কাছে সমাজের দরিদ্র এবং অজ্ঞাত মানুষের জীবন সাহিত্যের প্রধান বিষয় হয়ে ওঠে। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় ও বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় এ তিন লেখক রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্রের পর বাংলা সাহিত্যে প্রধান উপন্যাসকার হয়ে ওঠেন, তারাশঙ্করের 'হাঁসুলি বাঁকের উপকথা', বিভূতিভূষণের 'পথের পাঁচালী' এবং মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'পদ্মা নদীর মাঝি' বাংলা সাহিত্যের কালজয়ী উপন্যাস হিসেবে স্বীকৃত।

বাংলা ভাষায় সাহিত্যচর্চার প্রধান কেন্দ্র ছিল ঔপনিবেশিক ইংরেজদের গড়া নতুন নগরী ও রাজধানী কলকাতায়। সেখানে সমাগত হিন্দু মধ্যবিত্তই আধুনিক শিক্ষা গ্রহণ করে এবং বাংলা ভাষায় সাহিত্য চর্চায় তাদেরই ভূমিকা অনেকদিন পর্যন্ত অগ্রগণ্য ছিল। মুসলমান লেখকদের আবির্ভাব হয় পরবর্তী কালে। প্রথম পর্যায়ে আমরা মীর মশাররফ হোসেন, মোজাম্মেল হক, কাজী ইমদাদুল হক, নজিবর রহমান প্রমুখ লেখকদের পাই। এ শতাব্দীর প্রথমার্ধের মধ্যেই আমরা পেয়ে যাই কাজী আব্দুল ওদুদ, কাজী নজরুল ইসলাম, হুমায়ুন কবীর প্রমুখ লেখককে। এঁরা সাহিত্যের অন্যান্য শাখায় বেশি কাজ করলেও উপন্যাস রচনার ধারাবাহিকতায় এঁদের নাম স্মরণীয়। সাহিত্য ক্ষেত্রে এঁদের উত্তরসুরী শওকত ওসমান, আবু রুশদ্ এবং সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ। এঁরা আধুনিক চিন্তা ও ভাবধারার লেখক। সেই কারণে এঁদের উপন্যাসে আধুনিকতার বৈশিষ্ট্যসমূহ যথার্থভাবে উপস্থাপিত হতে দেখা যায়। ব্যক্তি, সমাজ, এবং সেই সঙ্গে সমগ্র জীবনকে বিশ্লেষণ করার দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে এঁরা উপন্যাস রচনা করেছেন। বলা যায়, এঁদের এবং এঁদের পরবর্তী প্রজন্মের লেখার মধ্য দিয়েই বাংলা ভাষায় উপন্যাসের ব্যাপক বিকাশ সাধিত হয়েছে। আমরা বলতে পারি বাংলা উপন্যাস এখন বিশ্ব সাহিত্যের মানে উন্নীত।

**পাঠোত্তর মূল্যায়ন**

১. বাংলা গদ্য রচনার প্রথম পর্যায়ের লেখক ও তাঁদের গ্রন্থের নাম লিখুন।

২. প্রথম পর্যায়ের বাংলা উপন্যাস ও লেখকদের নাম উল্লেখ করুন।

৩. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় ও সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ'র উপন্যাসের নাম লিখুন।

## পাঠ ৫

**উদ্দেশ্য**

**এ পাঠটি পড়ে আপনি–**

- লালসালু উপন্যাস সম্পর্কে একটি সাধারণ ধারণা লাভ করতে পারবেন।

'লালসালু' 'সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহর প্রথম উপন্যাস। কিন্তু তাহলেও এ রচনাটিকে আমরা একজন প্রতিভাবান লেখকের দুঃসাহসী প্রচেষ্টার সার্থক ফসল বলে বিবেচনা করতে পারি। আধুনিক ও নাগরিক রুচির অধিকারী উচ্চশিক্ষিত লেখক তখন কলকাতার অভিজাত ইংরাজি দৈনিক সংবাদপত্র The Statesman এর সাংবাদিক। ঐ সময় নাগরিক মধ্যবিত্তের জীবন তখন নানা ঘাত সংঘাতে অস্থির ও চঞ্চল। ব্রিটিশ শাসনবিরোধী আন্দোলন, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, দেশবিভাগ, উদ্বাস্তু সমস্যা, আবার একই সঙ্গে দেশ সদ্য স্বাধীন হওয়ার কারণে এবং নতুন রাষ্ট্র পাকিস্তান গঠনের উদ্দীপনায় মধ্যবিত্তের জীবন টালমাটাল– এমন এক ক্রান্তিকালে একজন নবীন লেখকের পক্ষে তাঁর চারদিকের পরিচিত জীবন ও মানুষ নিয়ে উপন্যাস লেখাই ছিল স্বাভাবিক ও সহজতর। কিন্তু তা না করে সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ এমন একটি পটভূমি ও মানুষের সমাজ বেছে নিলেন তার প্রথম উপন্যাসের জন্য, যার অবস্থান সমসাময়িকতা থেকে যেমন, তেমিন পাঠকের প্রত্যক্ষতা থেকে দূরবর্তী।

শহরবাসী মধ্যবিত্ত জীবনের ঘাত সংঘাতময় বিষয়গুলির সঙ্গে বাংলা সাহিত্যের একটি সহজ যোগাযোগ রয়েছে। সাহিত্যের জগতে মধ্যবিত্ত জীবন খুবই পরিচিত। কিন্তু সেটিই সমগ্র দেশের পরিচয় নয়। গ্রাম প্রধান আমাদের বৃহত্তর

দেশ ও সমাজ। বেশির ভাগ লোকই গ্রামে থাকে। সেখানেই তাদের বাঁচা-মরা এবং জীবন যাপন। সেই সমাজে এমন সব রীতিনীতি ও ধারণা বিশ্বাস জন্মলাভ করে লালিত হয়ে চালু থাকে যা শহরবাসী শিক্ষিত লোকের অভিজ্ঞতার বাইরে। তাকে দুঃসাহসী তরুণ লেখক সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ তাঁর প্রথম উপন্যাসের পটভূমি, পাত্রপাত্রী, এবং বিষয় সবই গ্রহণ করলেন সেই গ্রামীণ জীবন থেকে। তাঁর উপন্যাসের পটভূমি প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চল এবং তার সমাজ চরিত্র একদিকে কুসংস্কারাচ্ছন্ন ধর্মভীরু, শোষিত, দরিদ্র গ্রামবাসী, অন্যদিকে শঠ, প্রতারক ধর্মব্যবসায়ী এবং শোষক-ভূস্বামী। তাঁর উপন্যাসের বিষয় যুগযুগ ব্যাপী শেকড় গাড়া কুসংস্কার অন্ধবিশ্বাস ও ভীতির সঙ্গে সুস্থ জীবনাকাঙ্ক্ষার দ্বন্দ্ব।

লালসালুতে বাস্তবতাই প্রধান। লেখক আমাদের এমন এক গ্রামীণ সমাজে নিয়ে যান, যেখানে যুগযুগ ধরে মানুষের মনের চারদিক ঘিরে আছে অসম্ভব শক্তি অথচ অদৃশ্য এক বেষ্টনী - মানুষ যেখানে সমস্ত কিছুই ভাগ্য বলে মেনে নেয় আর অলৌকিকত্বের যেখানে তার অগাধ বিশ্বাস। সমস্ত ঘটনার মধ্যেই দেবশক্তির লীলা দেখতে পায় সে আর তাতে নিদারুন ভয় পায় অথচ শ্রদ্ধা ভক্তিতে আপ্লুত হয়ে একেবারে ভূমিতে নুয়ে পড়ে। কাহিনী যতই উন্মোচিত হতে থাকে ততোই দেখা যায় " শস্যের চাইতে টুপির সংখ্যা বেশি।" কেবলই কুসংস্কার আর অন্ধ বিশ্বাস সেই সঙ্গে অনিবার্য পরিণতি ভীতি এবং আত্মসমর্পণ। বিরুদ্ধে যায় না কেউ– গেলে তার ধ্বংস অনিবার্য হয়ে ওঠে। লেখক দেখান, এ এমনই এক সমাজ যার পরতে-পরতে কেবলই শোষণ আর শোষণ। দেহের, মনের এবং সামগ্রিক জীবনের। প্রতারণা, শঠতা, আর শাসনের জটিল এবং সংখ্যাবিহীন শেকড় জীবনের শেষপ্রান্ত পর্যন্ত ছড়ানো। আর ঐ সব শেকড় দিয়ে জীবনের প্রাণরস প্রতিনিয়তই শুষে নেওয়া হয়। আনন্দ, প্রেম, প্রতিবাদ, সততা এ সব বোধ এবং বুদ্ধি ঐ অদৃশ্য দেওয়ালে ঘেরা সমাজের ভেতরে প্রায়শই ঢাকা পড়ে যায়। দেখা যাবে অন্য কোথাও নয় দেশের ভেতরে আমাদের চারপাশেই এ সমাজের অবস্থান। বাংলাদেশের যে কোন প্রান্তের গ্রামাঞ্চলে সমাজের ভেতর ও বাইরের চেহারা এ একই রকম।

আবার এ সামাজিক অবস্থার ভেতরেও একটি বিপরীত দিক আছে। আর তা হল, মানুষের প্রাণধর্মের দিকটি। মানুষের প্রাণধর্মের দিকটি কী? মানুষ ভালবাসে, স্নেহ করে, কামনা বাসনা এবং আনন্দ বেদনায় উদ্বেল হয়। আবার ক্ষেত্র বিশেষে উল্লাসে-উচ্ছ্বাসে একেবারে ফেটে পড়ে। নিজের স্বাভাবিক ইচ্ছা ও বাসনার কারণেই সে নিজেকে আলোকিত ও বিকশিত করতে চায়। সংস্কার যতো শক্ত হোক, অন্ধবিশ্বাস যতো দৃঢ় হোক, ভয় যতো আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে রাখুক, প্রাণ ধর্মের সহজ প্রেরণা সমস্ত কিছু ছিঁড়ে ফেলে বেরিয়ে আসবে। যদি সফল নাও হয় তবু দ্বন্দ্বটি কখনও পরিত্যক্ত হয় না। প্রজন্ম থেকে জন্মান্তরে চলতে থাকে– হয়তো মুখোমুখি দ্বন্দ্বটা আমরা দেখি না। কিন্তু দ্বন্দ্বটি থাকে। মানব সম্পর্কের মধ্যে থাকে, দৈনন্দিন ও পারিবারিক জীবনে থাকে, এমনকি থাকে একই ব্যক্তির মনোলোকেও।

এমতাবস্থায় সংস্কারের ও অন্ধবিশ্বাসের, প্রতারণার এবং শোষণের সামাজিক অবস্থানটি যদি বাস্তব হয় তাহলে তার বিরুদ্ধে মানবিক প্রাণধর্মের স্বাভাবিক উত্থানজনিত দ্বন্দ্বটি অধিকতর বাস্তব। সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ এ দ্বন্দ্বময় সামাজিক বাস্তবতার চিত্রই এঁকেছেন তাঁর 'লালসালু' উপন্যাসে।

সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ মানবতাবাদী লেখক। মানুষের সর্বাঙ্গীন মুক্তি ও স্বাভাবিক বিকাশের আকাঙ্ক্ষা তাঁর সাহিত্য সাধনার পশ্চাতে যে সক্রিয় ছিল এ বিষয়ে দ্বিমতের অবকাশ কম। আমাদের দেশের সামাজিক বাস্তবতায় যা মানুষের স্বাভাবিক বিকাশের অন্তরায় সেগুলিকে তিনি চিহ্নিত করেছেন, দেখিয়েছেন কুসংস্কার ও অন্ধবিশ্বাসের কি প্রচণ্ড-দাপট। সরল ও ধর্মপ্রাণ সাধারণ মানুষকে কীভাবে বিভ্রান্ত ও ভীত করে শোষণের প্রক্রিয়া চালু রাখা হয় তার অনুপুঙ্খ বর্ণনা দিয়েছেন তিনি লালসালু উপন্যাসে। তাঁর আক্রমণের লক্ষ্য ধর্মবিশ্বাস নয়– ধর্মের নামে প্রচলিত কুসংস্কার। তিনি সেই সমাজের চিত্র তুলে ধরেন যেখানে 'শস্যের চেয়ে টুপী বেশি, ধর্মের চেয়ে ধর্মের আগাছা বেশি'। ধর্ম মানুষকে কল্যাণের পথে নিয়ে এসেছে কিন্তু কুসংস্কার এবং অন্ধবিশ্বাস ধর্মের মূল ভিত্তিটাকেই করে দিয়েছে দুর্বল। মানুষের মনকে আলোড়িত তো করেই নি বরং করে তুলেছে অধিকতর অন্ধকারাচ্ছন্ন এবং ভীত। সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহর আঘাত সেখানে। স্বার্থ ও লোভের বশবর্তী হয়ে একশ্রেণীর লোক যে কুসংস্কার ও অন্ধবিশ্বাসকে টিকিয়ে রাখার জন্য নানান ছলাকলার আশ্রয় নেয়। লেখক সামাজিক সেই বাস্তবতার চিত্রটি এঁকেছেন লালসালু উপন্যাসে।

গভীর মনোযোগ এবং অত্যন্ত যত্নের কাজ 'লাল সালু'। গতানুগতিক ঘটনা নির্বাচন ও উপভোগ্য কাহিনীর জন্য ঘটনা বিন্যাসের পথে অগ্রসর হননি লেখক। নরনারীর প্রেমের ঘটনা নেই একটিও। দুই প্রতিপক্ষের প্রত্যক্ষ দ্বন্দ্ব-সংঘাতের ঘটনাবহুল কাহিনীও ফুটিয়ে তোলা হয় নি এ উপন্যাসে। অথচ মানব জীবনেরই চেহারা দেখাতে চান তিনি –

মানুষেরই কাহিনী বর্ণনা করার অভিলাষ তাঁর। ফলে চরিত্র ও ঘটনার সেই সব গূঢ় ও রহস্যময় ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়াগুলি দেখতে ও দেখাতে হয়েছে তাঁকে যা জীবনকে চালায় এবং থামায়। যে ঘটনা বাহিরে ঘটে যায়, অধিকাংশেরই উৎস কোথায়? না মানুষের মনে লোভ, ঈর্ষা, লালসা, বিশ্বাস, ভয়, প্রভুত্ব কামনা এ সব প্রবৃত্তি ও বাসনা মানুষের মনে আছে বলেই বাহিরের বিচিত্র সব ঘটনা ঘটে। ধর্ম ব্যবসায়ীকে ভয় পায় মানুষ। কেন? না তার বিশ্বাস লোকটির পেছনে রহস্যময় একটি দৈবশক্তি কাজ করছে। আবার ধর্ম ব্যবসায়ী ভন্ডটির ভয় কিসে? না কে জানে, কোন মানুষ স্বাভাবিক প্রেরণা ও বুদ্ধি বলে তার প্রতাপ ও প্রতিষ্ঠার ভিত্তিটাকে ধ্বসিয়ে দেবে। নরনারীর মনের নানান ক্রিয়া প্রতিক্রিয়াগুলিই লেখকের বিষয় হয়ে উঠেছে 'লালসালু'তে।

এমনিতে উপরিকাঠামোর সাধারণ বিচারে আমরা বলতে পারি যে 'লাল সালু' একটি সামাজিক সমস্যামূলক উপন্যাস। নিরক্ষর দরিদ্র ও কুসংস্কারাচ্ছন্ন গ্রামবাসীর সরলতা ও ধর্ম বিশ্বাসের সুযোগ নিয়ে এক ভন্ড ধর্মব্যবসায়ী তার জটিল, কুটিল ছলনাজাল বিস্তার করে কীভাবে নিজের শাসন ও শোষণের অধিকার প্রতিষ্ঠিত করেছে তারই বিবরণ দেওয়া হয়েছে 'লাল সালু' উপন্যাসে। কাহিনীটি বড় নয় কিন্তু এর বিন্যাসটি একই সঙ্গে জটিল ও মজবুত। ঘটনা খুব বেশি নেই, কিন্তু এমন ধরনের বিশ্লেষণমূলক বিস্তার লক্ষ্য করা যায় প্রতিটি ঘটনার পেছনে, যে তাতেই অতি সাধারণ কাহিনী এবং ঘটনা দুই-ই অসামান্য এবং তাৎপর্যময় হয়ে ওঠে।

### পাঠোত্তর মূল্যায়ন

১. 'লালসালু' কোন সালে রচিত হয় ঐ সময় দেশের অবস্থা কেমন ছিল সংক্ষেপে উল্লেখ করুন।

২. 'লালসালু' উপন্যাসের কাহিনীতে দুটি প্রতিপক্ষের দ্বন্দ্বের কথা আছে– প্রতিপক্ষ দুটি কি কি?

৩. লাল সালু কোন শ্রেণীর উপন্যাস?

৪. লালসালু উপন্যাসে একটি দ্বন্দ্ব আছে, দ্বন্দ্বটি কেন এবং কার সঙ্গে কার?

## পাঠ ৬

**উদ্দেশ্য**

**এ পাঠটি পড়ে আপনি–**

- উপন্যাসের সঙ্গে আখ্যান কাব্য, নাটক ও ছোটগল্পের পার্থক্য কী তা লিখতে পারবেন।

চতুর্দশ/পঞ্চদশ শতাব্দীর ইয়োরোপীয় রেনেসাঁ বা নবজাগরণের কাল থেকে আরম্ভ করে বর্তমান শতাব্দী পর্যন্ত সময় কালের মধ্যে উপন্যাসের উদ্ভব ও পর্ণ বিকাশ সাধিত হয়েছে। গদ্যে লেখা মানবজীবনের বাস্তবতা ভিত্তিক দীর্ঘ কাহিনীকেই আমরা উপন্যাস বলে থাকি। একই সময়কালের মধ্যে মানুষের জীবন বাস্তবতা অবলম্বনে আরও এক ধরনের নতুন গদ্য কাহিনী লেখা শুরু হয়, যার বিস্তার দীর্ঘ নয় এবং যার অবলম্বন মানুষের সমগ্র জীবন নয়। মানব জীবনের বিশেষ কোন দিক অথবা জীবন সম্পর্কিত কোন সত্য কিংবা কোন আনন্দ বা বেদনাঘন মুহ *র্তকে যখন স্বল্প* পরিসরে গদ্য কাহিনীর মাধ্যমে ফুটিয়ে তোলা হয় তখনই তা হয় ছোটগল্প।

সুতরাং উপন্যাস ও ছোটগল্পের মধ্যে উপাদানগত মিল থাকলেও দুইয়ের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যে ভিন্ন হওয়ায় দুটিকেই আলাদা আঙ্গিকের শিল্প বলে বিশেষজ্ঞরা নির্ধারণ করেছেন।

আখ্যান কাব্য এবং মহাকাব্যের চরিত্র ও কাহিনী দুই-ই আছে তা সত্ত্বেও এ দুই শ্রেণীর সাহিত্য উপন্যাসের বিকল্প হতে পারে না। কারণ গদ্যে লিখিত উপন্যাসে জীবনের খুঁটিনাটি বিষয়াদি এবং মানব চরিত্রের জটিল ও রহস্যময় আচরণ বিশ্লেষণ ও উত্থাপন করা সম্ভব যা কাব্যে বা মহাকাব্যে সম্ভব হয় নি।

আবার উপন্যাস এবং নাটকের মধ্যে বিষয়গত কিছু সাদৃশ্য থাকলেও উপাদান ও উপস্থাপনের দিক থেকে দুটি সর্ম্পূর্ণ আলাদা। একটি কাহিনীকে মঞ্চের ওপর পাত্রপাত্রীর অভিনয়ের মাধ্যমে জীবন্ত করে তোলা হলে তাকে বলা হয় নাটক। অধিকন্ত যে কাহিনীটি নাট্যকার লিপিবদ্ধ করেন তাতে বিশ্লেষণ বা বর্ণনার কোনো সুযোগ নেই; সবই প্রকাশ করা হয় পাত্রপাত্রীর সংলাপের মাধ্যমে। সুতরাং মানবিক কাহিনী এবং চরিত্র থাকলে ও নাটক ও উপন্যাসের পার্থক্য দুস্তর, যদিও বহু বিখ্যাত উপন্যাসকে সার্থকভাবে নাটকে রূপান্তরিত করা হয়েছে।

## পাঠোত্তর মূল্যায়ন

১. ছোট গল্প ও উপন্যাসের মধ্যে সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য কোথায় তা উল্লেখ করুন।

২. নাটক ও উপন্যাসের মধ্যে মিল কোন ক্ষেত্রে তা দেখান।

# ইউনিট ১

## পাঠ ১

**উদ্দেশ্য**

**এ পাঠটি পড়ে আপনি–**

- গ্রাম বাংলার একটি বিশেষ অঞ্চলের মানুষের জীবনধারা সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত বর্ণনা লিখতে পারবেন।
- এ অঞ্চলের মানুষের ধর্মসংলগ্নতা, পশ্চাদপদতা ও জীবনসংগ্রাম সম্পর্কে একটি অনুচ্ছেদ লিখতে পারবেন।

| | |
|---|---|
| ☞ | মূল অংশটি ভালো করে পড়ুন এবং ঘটনা ধারা বুঝতে চেষ্টা করুন। কঠিন, অজানা ও আঞ্চলিক শব্দ ও বাক্যরীতি, বাগধারার অর্থ, ব্যাকরণ ইত্যাদির জন্য শব্দার্থ ও টীকা দেখুন। অন্যান্য পাঠগুলো একইভাবে পড়ুন। |

## মূলপাঠ

শস্যহীন জনবহুল এ অঞ্চলের বাসিন্দাদের বেরিয়ে পড়বার ব্যাকুলতা ধোঁয়াটে আকাশকে পর্যন্ত যেন সদাসন্ত্রস্ত করে রাখে। ঘরে কিছু নেই। ভাগাভাগি, লুটালুটি, আর স্থানবিশেষে খুনাখুনি করে সর্বপ্রচেষ্টার শেষ। দৃষ্টি বাইরের পানে, মস্ত নদীটির ওপারে, জেলার বাইরে-প্রদেশেরও; হয়তো-বা আরো দূরে। যারা নলি বানিয়ে ভেসে পড়ে তাদের দৃষ্টি দিগন্তে আটকায় না। জ্বালাময়ী আশা; ঘরে হা-শূন্য মুখ থোবড়ানো নিরাশা বলে তাতে মাত্রাতিরিক্ত প্রখরতা। দূরে তাকিয়ে যাদের চোখে আশা জ্বলে তাদের আর তর সয় না, দিনমানক্ষণের সবুর ফাঁসির সামিল। তাই তারা ছোটে, ছোটে।

অন্য অঞ্চল থেকে গভীর রাতে যখন ঝিমধরা রেলগাড়ি সর্পিল গতিতে এসে পৌছোয় এ-দেশে তখন হঠাৎ আগাগোড়া তার দীর্ঘ দেহে ঝাকুনি লাগে, ঝনঝন করে ওঠে লোহালক্কড়। রাতের অন্ধকারে লণ্ঠন জ্বালানো ঘুমন্ত কত স্টেশন পেরিয়ে এসে এখানে নিদ্রাচ্ছন্ন ট্রেনটির সমস্ত চেতনা জেগে সজারুকাঁটা হয়ে ওঠে। তাছাড়া এদের বহির্মুখ উন্মত্ততা আগুনের হল্কার মত পুড়িয়ে দেয় দেহ। রেলগাড়ির খুপরিগুলো থেকে আচমকা জেগে-ওঠা যাত্রীরা কেউ বা ভয় পেয়ে কেউ-বা অপরিসীম কৌতূহলে মুখ বাড়ায়, দেখে আবছা-অন্ধকারে ছুটোছুটি করতে থাকা লোকদের। কোথায় যাবে তারা? কিসের এত উম্মত্ততা, কিসের এত অধীরতা? এ লাইনে যারা নোতুন তারা চেয়ে চেয়ে দেখে। কিন্তু এরা ছোটে। ছোটে আর চীৎকার করে। গাড়ির এ-মাথা থেকে ও-মাথা। এতগুলো খুপরির মধ্যে কোনটাতে চড়লে কপাল ফাটবে-তাই যেন খুঁজে দেখে। ইতিমধ্যে আত্মীয়-স্বজন, জানপছানের লোক হারিয়ে যায়। কারো জামা ছেঁড়ে, কারো টুপিটা অন্যের পায়ের তলায় দুমড়ে যায়। কারো-বা আসল জিনিসটা, অর্থাৎ বদনাটা-যা না হলে বিদেশে এক পা চলে না– কি করে আলগোছে হারিয়ে যায়। হারাবে না কেন? দেহটা গেলেই হয়– এমন একটা মনোভাব নিয়ে ছুটোছুটি করলে হারাবেই তো। অনেকের অনেক সময় গলায় ঝোলানো তাবিজের থোকাটা ছাড়া দেহে বিন্দুমাত্র বস্ত্র থাকে না শেষ পর্যন্ত। তারা অবশ্য বয়সে ছোকড়া। বয়স হলে এরা আর কিছু না হোক শক্ত করে গিরেটা দিতে শেখে।

অজগরের মত দীর্ঘ রেলগাড়ির কিন্তু ধৈর্যের সীমা নেই। তার দেহ ঝনঝন করে লোহালক্কড়ের ঝঙ্কারে, উত্তাপলাগা দেহ কেঁপে কেঁপে ওঠে, কিন্তু হঠাৎ উঠে ছুটে পালায় না। দেহচ্যুত হয়ে অদূরে অস্পষ্ট আলোয় ইঞ্জিনটা পানি খায়। পানি খায় ঠিক মানুষের মতই। আর অপেক্ষা করে ধৈর্যের কাটা নড়ে না।

কেনই বা নড়বে? নিশুতি রাতে যে-দেশে এসে পৌঁছেচে সে-দেশ এখন অন্ধকারে ঢাকা থাকলেও সে জানে যে, তাতে শস্য নেই। বিরাণ মাঠ, সর-ভাঙ্গা পাড় আর বন্যা-ভাসানো ক্ষেত। নদীগহ্বরেও জমি কম নেই।

সত্যি শস্য নেই। যা আছে তা যৎসামান্য। শস্যের চেয়ে টুপি বেশি, ধর্মের আগাছা বেশি। ভোর বেলায় এত মক্তবে আর্তনাদ ওঠে যে, মনে হয় এটা খোদাতা'লার বিশেষ দেশ। ন্যাংটা ছেলেও আমসিপারা পড়ে, গলা ফাটিয়ে মৌলবীর বয়স্ক গলাকে ডুবিয়ে সমস্বরে চেঁচিয়ে পড়ে। গোঁফ উঠতে না উঠতেই কোরান হেফ্জ করা সারা। সঙ্গে সঙ্গে মুখেও কেমন একটা ভাব জাগে। হাফেজ তারা। বেহেস্তে তাদের স্থান নির্দিষ্ট।

কিন্তু দেশটা কেমন মরার দেশ। শস্যশূন্য। শস্য যা বা হয় তা জনবহুলতার তুলনায় যৎসামান্য। সেই হচ্ছে মুশকিল। এবং তাই খোদার পথে ঘনিষ্ঠ হয়ে আসার চেতনায় যেমন একটা বিশিষ্টভাব ফুটে ওঠে, তেমনি না খেতে পেয়ে চোখে আবার কেমন একটা ভাব জাগে। শীর্ণদেহ নরম হয়ে ওঠে, আর স্বাভাবিক সরুগলা কেরাতের সময় মধু ছড়ালেও এদিকে দীনতায় আর অসহায়তায় ক্ষীণতর হয়ে ওঠে। তাতে দিন-কে দিন ব্যথা-বেদনা আঁকিবুকি কাটে। শীর্ণ চিবুকের আশে-পাশে যে-কটা ফিকে দাড়ি অসংযত দৌর্বল্যে ঝুলে থাকে তাতে মাহাত্ম্যফোটাতে চায়, কিন্তু ক্ষুধার্ত চোখের তলে চামড়াটে চোয়ালের দীনতা ঘোচে না। কেউ কেউ আরো আশা নিয়ে আলিয়া মাদ্রাসায় পড়ে। বিদেশে গিয়ে পোকায় খাওয়া মস্ত মস্ত কেতাব খতম করে। কিন্তু কেতাবে যে বিদ্যে লেখা তা কোন এক বিগত যুগে চড়ায় পড়ে আটকে গেছে। চড়া কেটে সে-বিদ্যেকে এত যুগ অতিক্রম করিয়ে বর্তমান স্রোতের সঙ্গে মিশিয়ে দেবে এমন লোক আবার নেই। অতএব কেতাবগুলোর বিচিত্র অক্ষরগুলো দূরান্ত কোন এক অতীতকালের অরণ্যে আর্তনাদ করে।

তবু আশা, কত আশা। খোদাতা'লার ওপর প্রগাঢ় ভরসা। দিন যায় অন্য এক রঙিন কল্পনায়। কিন্তু ক্ষুধার্ত চোখ বৈরিভাবাপন্ন ব্যক্তি সুখ-উদাসীন দুনিয়ার পানে চেয়ে চেয়ে আরো ক্ষয়ে আসে। খোদার এলেমে বুক ভরে না তলায় পেট শূন্য বলে। মসজিদের বাঁধানো পুকুরপাড়ে চৌকোণ পাথরের খণ্ডটার ওপর বসে শীতল পানিতে অজু বানায়, টুপিটা খুলে তার গহ্বরে ফুঁ দিয়ে ঠাণ্ডা করে আবার পরে। কিন্তু শান্তি পায় না। মন থেকে-থেকে খাবি খায়, দিগন্তে ঝলকানো রোদের পানে চেয়ে চোখ পুড়ে যায়।

এরা তাই দেশ ত্যাগ করে। ত্যাগ করে সদলবদলে বেরিয়ে ছড়িয়ে পড়ে। নলি বানিয়ে জাহাজের খালাসী হয়ে ভেসে যায়, কারখানার শ্রমিক হয়, বাসাবাড়ির চাকর, দফতরির এটকিনি, ছাপাখানার ম্যাশিনম্যান, টেনারীতে চামড়ার লোক। কেউ মসজিদে ইমাম হয়, কেউ মোয়াজ্জিন। দেশময় কত সহস্র মসজিদ। কিন্তু শহরের মসজিদ, শহরতলীর মসজিদ– এমন কি গ্রামে গ্রামে মসজিদগুলো পর্যন্ত আগে থেকে দখল হয়ে আছে। শেষে কেউ কেউ দূরদূরান্তে চলে যায়। হয়তো বাহে-মুলুকে, হয়তো মনিদের দেশে। দূর দূর গ্রামে– যে গ্রামে পৌঁছুতে হলে, কত চড়া-পড়া শুষ্ক নদী পেরোতে হয়, মোষের গাড়িতে খড়ের গাদায় ঘুমোতে হয় কত রাত। গারো পাহাড়ে দুর্গম অঞ্চলে কে কবে বাঁশের মসজিদ করেছিল– সেখানেও।

এক সরকারি কর্মচারী সেখানে হয়তো একদিন পায়ে বুট এঁটে শিকারে যায়। বাইরে বিদেশী পোশাক, মুখমণ্ডলও মসৃণ। কিন্তু আসলে ভেতরে মুসলমান। কেবল নোতুন খোলস পরা নব্য শিক্ষিত মুসলমান।

সে এ দুর্গম অঞ্চলে মিহি কণ্ঠে আজান শুনে চমকে ওঠে। সঙ্গে সঙ্গে তার শিকারের আশাও কিছু দমে যায়।

পরে মৌলবীর সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়। আত্মীয়-স্বজন ছেড়ে বনবাসে দিন কাটানোর ফলে লোকটার চোখেমুখে নিঃসঙ্গতার বন্য শূন্যতা।

—আপনার দৌলতখানা?

শিকারি বলে।

—আপনার নাম?

নাম শুনে মৌলবীর চোখ উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। তাছাড়া মুহূর্তে খোদার দুনিয়া চোখের সামনে আলোকিত হয়ে ওঠে!

শিকারিও পাল্টা প্রশ্ন করে। বাড়ির কথা বলতে গিয়ে হঠাৎ মৌলবীর মনে স্মৃতি জাগে। কিন্তু সংযত হয়ে বলে, এধারের লোকদের মধ্যে খোদাতা'লার আলোর অভাব। লোকগুলো অশিক্ষিত কাফের। তাই এদের মধ্যে আলো ছড়াতে এসেছে। বলে না যে, দেশে শস্য নেই, দেশে নিরন্তর টানাটানি, মরার খরা।

দূর জঙ্গলে বাঘ ডাকে। কচিৎ কখনো হাতিও দাবড়ে কুঁদে নেমে আসে। কিন্তু দিনে পাঁচ-পাঁচবার দীর্ঘ শালগাছ ছাড়িয়ে একটা ক্ষীণগলা জাগে—মৌলবীর গলা। বুনো ভারি হাওয়ায় তার হাল্কা ক-গাছি দাড়ি ওড়ে এবং গভীর রাতে হয়তো চোখের কোণটা চকচক করে ওঠে বাড়ির ভিটেটার জন্যে।

কিন্তু সেটা শিকারির কল্পনা। আস্তানায় ফিরে এসে বন্দুকের নল সাফ করতে করতে শিকারি কল্পনা করে সে-কথা। তবে নোতুন এক আলোর ঝলকে মৌলবীর চোখ যে দীপ্ত হয়ে ওঠে সে কথা জানে না; ভাবতেও পারে না হয়তো।

## শব্দার্থ ও টীকা

**শস্যহীন জনবহুল এ অঞ্চলের** – বাংলাদেশের একটি বিশেষ অঞ্চলের বর্ণনা দিতে গিয়ে ঔপন্যাসিক বলেছেন- এখানে খাদ্যশস্যের প্রকট অভাব অথচ জনসংখ্যার ভারে মানুষ গিজ গিজ করছে। **বাসিন্দাদের** – অধিবাসীদের। **বেরিয়ে পড়বার ব্যাকুলতা** – কাজের খোঁজে বা চাকরির সন্ধানে বাইরে ছুটে যাওয়ার জন্য আগ্রহ। **ধোঁয়াটে আকাশকে পর্যন্ত সদাসন্ত্রস্ত করে রাখে** – ধোঁয়াটে আকাশ অজানা ভবিষ্যৎ, অনিশ্চয়তা ও আঁধারের প্রতীক। যে অঞ্চলের কথা লেখক এখানে বর্ণনা করেছেন তাদের অভাব অনটনের জীবন এতই অনিশ্চিত যে তা যেন ধোঁয়াটে আকাশকেও হার মানায়। **নলি** – ভেলা চালানোর জন্য লম্বা বাঁশের কঞ্চি। **জ্বালাময় আশা** – তীব্র জ্বালা ও ক্ষুধা মিশ্রিত আশা। **হা শূন্য** – অভাবগ্রস্ত। **মুখথোবড়ানো** – পর্যুদস্ত, ক্লান্ত। **দিনমানক্ষণের সবুর** – সামান্য সময়ের জন্য অপেক্ষা। দেরী করা সহ্য হয় না। তর সয় না। **ফাঁসির সামিল** – ফাসির শাস্তির ন্যায় কষ্টকর। **ঝিমধরা** – আচ্ছন্ন। **সর্পিল গতিতে** – সাপের চলার মতো আঁকাবাঁকা গতিতে আস্তে আস্তে। সজারু কাঁটা হয়ে ওঠে – আচমকা জেগে ওঠে। বহির্মুখী উন্মত্ততা – বাইরে ছুটে যাওয়ার জন্য পাগল হয়ে ওঠা। **অপরিসীম** – সীমাহীন। **জানপছানের লোক** – আত্মস্বজন, প্রাণ প্রিয় লোক, প্রিয়জন। **আলগোছে** – আলগাভাবে, পৃথকভাবে। **নিদ্রাচ্ছন্ন** – ঘুমে বিভোর, ঘুমন্ত। **দেহচ্যুত হয়ে** – ট্রেনের বগি থেকে ইঞ্জিন যখন পৃথক হয়ে পড়ে। **নিশুতি রাত** – গভীর রাত। **বিরাণ** – ফাঁকা, খালি। **সরভাঙা পাড়** – নদীর প্রবল স্রোতে ভেঙে যাওয়া পাড়। **শস্যের চেয়ে টুপি বেশি** – খাদ্যশস্যের অভাব হলেও মাথায় টুপি পরা মুসলমানের সংখ্যা বেশি। **ধর্মের আগাছা বেশি** – সত্যিকারের ধর্মভাবের চেয়ে কুসংস্কারের প্রাধান্যই বেশি। **হেফজ করা** – মুখস্থ করা। **শীর্ণ দেহ** – চিকন দুর্বল শরীর। **সরুগলা কেরাত** – চিকন মিহি সুরে কোরানের সুরা পড়া। **ফিকে দাড়ি** – পাতলা দাড়ি। **চড়া কেটে সে বিদ্যেকে এত যুগ অতিক্রম করিয়ে বর্তমান স্রোতের সঙ্গে মিশিয়ে দেবে** – অতীতের ধর্মীয় শিক্ষাকে বর্তমানের যুগোপযোগী শিক্ষার সঙ্গে সংযোগ ঘটিয়ে উপযোগী করে তোলা। **বৈরিভাবাপন্ন** – শত্রুভাবাপন্ন। **খোদার এলেম** – ধর্মীয় বিদ্যা। **বাহে মুলুকে** – উত্তরবঙ্গে। **দৌলতখানা** – বাড়ি বা ঠিকানা। ক্বচিৎ – কদাচিত, কখনও কখনও। **দীপ্ত** – আলোয় ভরা।

## বাগ্‌ধারা

**খাবি খায়** – কূল কিনারা খুঁজে পায় না।

**মরার খরা** – যে বৃষ্টিহীনতা মরণ নিয়ে আসে।

**দাবড়ে কুঁদে** – দাপট দেখিয়ে।

**ঝিমধরা** – স্তব্ধ হওয়া।

**আগুনের হলকার মত** – আগুনের প্রচণ্ড গরমের মত।

## পাঠসংক্ষেপ

দারিদ্র্য, অভাব ও ক্ষুধাক্লিষ্ট নোয়াখালী জেলার গ্রামাঞ্চল। এ অঞ্চল যেমন জনবহুল তেমনি নদীবহুলও বটে। তবে ক্ষেতে শস্য নেই, কর্মসংস্থানের কোন সুযোগ নেই। তাই লোকজন দেশের নানা অঞ্চলে সামান্য কাজের জন্য ছুটে বেড়ায়। শহর, গ্রাম, বন্দর যেখানেই হোক কাজ চাই। যত দুর্গম অঞ্চল হোক তারা সেখানে ছুটে যায়, কাজের আশায়। নিবিড় রাতে নিস্তব্ধ স্টেশনে রেলগাড়ির খুপরিতে তারা ঢুকে পড়ে। অজানা পথে তারা পাড়ি জমায়। পথের সম্বল তাদের পুটলি-বদনা, কারও কারও পুঁথিগত কিছু ধর্মবিদ্যা। কেউ আমসিপারা পড়া, কেউ কোরানে হাফেজ, কেউবা আলীয়া মাদ্রাসা ডিঙানো। এমনকি কেউ কেউ বিদেশে গিয়ে বড় বড় ভারি ভারি কেতাব ও মন্থন করেছে। যদিও এগুলোর অর্থ কোনদিন বুঝেনি। শহরে বন্দরে গ্রামে, নদীতে সমুদ্রে যেখানেই হোক কাজ চাই। হোক না এ কাজ জাহাজের খালাসী, কারখানার শ্রমিক, ছাপাখানার মেশিনম্যান ইত্যাদি। কেউ কেউ হয় মসজিদের ইমাম, কেউ

মোয়াজ্জিন। শহর-বন্দরে হাজারো মসজিদ। তারপরও কর্মসংস্থান হয় না। যমুনা পার হয়ে কেউ চলে যায় উত্তরবঙ্গে কেউ বা গারো পাহাড়ের দুর্গম জঙ্গলে। এমনি জঙ্গলময় নিভৃত গারো অঞ্চলে এক বাঁশের তৈরি মসজিদ আঁকড়ে পড়ে আছে একজন, সেও সুদুর নদীআশ্রিত অঞ্চল নোয়াখালী থেকে আসা- এ মসজিদের ইমাম। একদিন দেখা হয় এক শিকারীর সঙ্গে। সে তাকে বলে ভিন্ন কথা। বলে খোদা তালার আলো ছড়াতে সে এসেছে এখানে।

## প্রসঙ্গ নির্দেশ করে ব্যাখ্যা লিখুন

| | |
|---|---|
| ☞ | যে ব্যাখ্যাগুলো লিখে দেয়া হয়েছে সেগুলো ভাল করে পড়ুন। বাকিগুলো নিজে নিজে লিখুন। |

**মনে হয় এটা খোদাতালার বিশেষ দেশ।**

সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহর 'লালসালু' উপন্যাসের এ অংশে নোয়াখালী অঞ্চলের জনজীবনের চিত্র প্রতিফলিত হলেও গ্রাম বাংলার ধর্মপ্রভাবিত জীবনধারার মূলসুর এখানে খুঁজে পাওয়া যায়।

জীবনের কোন স্পর্শ নেই জনসংখ্যায় ঠাসা এমন গ্রাম বাংলাদেশে অনেক। কিন্তু যে অঞ্চলের বর্ণনা লেখক এখানে দিয়েছেন সেখানে এত অভাবের মধ্যেও ভোরবেলায় মক্তবে কচিকণ্ঠে ধ্বনিত হয়ে ওঠে আমসিপারা পড়ার কোলাহল। পরনে কাপড় নেই, পেটে ভাত নেই, ন্যাংটো ক্ষুধাতুর ছেলেরাও সেই কোলাহলের অংশীদার। তাই লেখক কিছুটা ব্যঙ্গাত্মক ভাষায় বলেছেন এটা হয়ত খোদাতালার বিশেষ একটা অঞ্চল যেখানে মানুষ এত ধর্মসংলগ্ন।

## উপমা ও প্রতীকের ব্যবহার

**১. 'শস্যের চেয়ে টুপি বেশি, ধর্মের আগাছা বেশি।' এ বাক্যে শস্য, টুটি ও আগাছা শব্দগুলো লেখক কোন অর্থে ব্যবহার করেছেন?**

**উত্তর :** লেখক 'শস্য' বলতে খাদ্য, 'টুপি' অর্থে ধর্মভাবাপন্ন মুসলমান ও 'ধর্মের আগাছা' বলতে কুসংস্কারচ্ছন্ন তথাকথিত ধর্মভাবাপন্ন মানুষদের কথা বুঝিয়েছেন। আসলে গ্রাম বাংলার অনেক অঞ্চলের চিত্র এ রকম। প্রচুর লোকজন, কাজকর্ম নেই, খাদ্যের অভাব। কিন্তু মুসলমান অধ্যুষিত অঞ্চলে ছেলেবুড়ো সবার মাথাতেই টুপি।

# পাঠ ২

**উদ্দেশ্য**

**এ পাঠটি পড়ে আপনি–**

- গ্রাম বাংলায় মাছ ধরার একটি চিরন্তন দৃশ্যের বর্ণনা দিতে পারবেন।
- মজিদের মহব্বতনগর গ্রামে প্রবেশ ও খালেক ব্যাপারীর বাড়িতে প্রথম জমায়েতের কথা বর্ণনা করতে পারবেন।

# মূলপাঠ

একদিন শ্রাবণের শেষাশেষি নিরাক পড়েছে। হাওয়াশূন্য স্তব্ধতায় মাঠ প্রান্তর আর বিস্তৃত ধান ক্ষেত নিথর, কোথাও একটু কম্পন নেই। আকাশে মেঘ নেই। তামাটে নীলাভ রঙ দিগন্ত পর্যন্ত স্থির হয়ে আছে।

এমনি দিনে লোকেরা ধানক্ষেত্রে নৌকা নিয়ে বেরোয়। ডিঙ্গিতে দু-দুজন করে, সঙ্গে কোঁচ-জুতি। নিস্পন্দ ধান-ক্ষেত্রে প্রগাঢ় নিঃশব্দতা। কোথাও একটা কাক আর্তনাদ করে উঠলে মনে হয় আকাশটা বুঝি চটের মতো চিরে গেলো। অতি সন্তর্পণে ধানের ফাঁকে ফাঁকে তারা নৌকা চালায়; ঢেউ হয় না, শব্দ হয় না। গলুই-এ মূর্তির মত দাঁড়িয়ে থাকে একজন-চোখে ধারালো দৃষ্টি। ধানের ফাঁকে ফাঁকে সাপের সর্পিল সূক্ষ্মগতিতে সে-দৃষ্টি এঁকেবেঁকে চলে।

বিস্তৃত ধানক্ষেতের একপ্রান্তে তাহের-কাদেরও আছে। তাহের দাঁড়িয়ে সামনে– চোখে তার তেমনি শিকারির সুচাগ্র একাগ্রতা। পেছনে তেমনি মূর্তির মতো বসে কাদের ভাই-এর ইশারার অপেক্ষায় থাকে। দাঁড় বাইছে, কিন্তু এমন কৌশলে যে, মনে হয় নীচে পানি নয়, তুলো।

হঠাৎ তাহের ঈষৎ কেঁপে উঠে মুহূর্তে শক্ত হয়ে যায়। সামনের পানে চেয়ে থেকেই পেছনে আঙ্গুল দিয়ে ইশারা করে। সামনে, বাঁয়ে। একটু বাঁয়ে ক-টা শিষ নড়ছে– নিরাকপড়া বিস্তৃত ধানক্ষেতকে কেমন স্পষ্ট দেখায় সে-নড়া। আরো বাঁয়ে। সাবধান, আস্তে। তাহেরের আঙ্গুল অদ্ভুত ক্ষিপ্রতায় এসব নির্দেশই দেয়।

ততক্ষণে সে পাশ থেকে আলগোছে কোঁচটা তুলে নিয়েছে। নিতে একটুও শব্দ হয়নি। হয়নি তার প্রমাণ, ধানের শিষ এখনো ওখানে নড়ছে। তারপর কয়েকটা নিঃশ্বাসরুদ্ধ-করা মুহূর্ত। দূরে যে-কটা নৌকা ধান-ক্ষেতের ফাঁকে ফাঁকে এমনি নিঃশব্দে ভাসছিলো, সেগুলো থেমে যায়। লোকেরা স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে ধনুকের মত টান-হয়ে ওঠা তাহেরের কালো দেহটির পানে। তারপর দেখে, হঠাৎ বিদ্যুৎ চমকের মত সেই কালো দেহের ঊর্ধ্বাংশ কেঁপে উঠলো, তীরের মত বেরিয়ে গেলো একটা কোঁচ। সা–ঝাক্।

একটু পরে একটা বৃহৎ রুই মুখ হা-করে ভেসে ওঠে।

আবার নৌকা চলে। ধীরে ধীরে, সন্তর্পণে।

এক সময় ঘুরতে ঘুরতে তাহেরদের নৌকা মতিগঞ্জের সড়কটার কাছে এসে পড়ে। কাদের পেছনে বসে তেমনি নিষ্পলক দৃষ্টিতে চেয়ে আছে তাহেরের পানে তার আঙ্গুলের ইশারার জন্যে। হঠাৎ এক সময়ে দেখে, তাহের সড়কের পানে চেয়ে কী দেখছে, চোখে বিস্ময়ের ভাব। সেও সেদিকে তাকায়। দেখে, মতিগঞ্জের সড়কের ওপরেই একটি অপরিচিত লোক আকাশের পানে হাত তুলে মোনাজাতের ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে আছে, শীর্ণ মুখে ক-গাছি দাড়ি, চোখ নিমীলিত। মুহূর্তের পর মুহূর্ত কাটে, লোকটির চেতনা নেই। নিরাকপড়া আকাশ যেন তাকে পাথরের মূর্তিতে রূপান্তরিত করেছে।

কাদের আর তাহের অবাক হয়ে চেয়ে চেয়ে দেখে। মাছকে সতর্ক করে দেবার ভয়ে কথা হয় না, কিন্তু পাশেই একবার ধানের শিষ স্পষ্টভাবে নড়ে ওঠে, ঈষৎ আওয়াজও হয়–সেদিকে দৃষ্টি নেই।

এক সময়ে লোকটি মোনাজাত শেষ করে। কিছুক্ষণ কী ভেবে ঝট করে পাশে নামিয়ে রাখা পুটুলিটা তুলে নেয়। তারপর বড় বড় পা ফেলে উত্তর দিকে হাঁটতে থাকে। উত্তর দিকে খানিকটা এগিয়ে মহ্বতনগর গ্রাম। তাহের ও কাদেরের বাড়ি সেখানে।

অপরাহ্নে র দিকে মাছ নিয়ে দু-ভাই বাড়ি ফিরে দেখে খালেক ব্যাপারীর ঘরে কেমন একটা জটলা। সেখানে গ্রামের লোকেরা আছে, তাদের বাপও আছে। সকলের কেমন গম্ভীর ভাব, সবার মুখ চিন্তায় নত। ভেতরে উঁকি মেরে দেখে, একটু আলগা হয়ে বসে আছে সেই লোকটা– নৌকা থেকে মতিগঞ্জের সড়কের ওপর তখন যাকে মোনাজাত করতে দেখেছিল। রোগা লোক, বয়সের ধারে যেন চোয়াল দুটো উজ্জ্বল। চোখ বুজে আছে। কোটরাগত নিমীলিত সে চোখে একটুও কম্পন নেই।

## শব্দার্থ ও টীকা

**নিরাক পড়া** – হাওয়া বাতাসহীন গুমোট আবহাওয়া। **নিস্পন্দ** – কোনরূপ শব্দহীন সূচাগ্র। **একাগ্রতা** – সূচের আগার মতো তীক্ষ্ণ তা সম্পন্ন একমুখী দৃষ্টি। **নিথর** – নিস্তব্ধ, নিশ্চল। **কোঁচ-জুতি** – বিল থেকে মাছ ধরার জন্য লোহার তৈরি ধারালো ফলার বল্লম জাতীয় হাতিয়ার। **সন্তর্পণে** – সাবধানে। **পানি নয় তুলো** – বিলে নৌকা এত সাবধানে ও নিঃশব্দে চলে যেন মনে হয় পানির ওপর দিয়ে নয় তুলোর ওপর দিয়েই চলছে নৌকা। **নিস্পলক** – চোখের পাতা না ফেলে। **কোটরাগত নিমীলিত চোখ** – ভেতরে বোঁজা দুটি চোখ।

## পাঠসংক্ষেপ

শ্রাবণের মেঘহীন হাওয়াবিহীন আকাশ। গ্রামের বিলের পানি নিথর স্থির হয়ে আছে। তাহের কাদের ডিঙিতে করে মাছ ধরতে বেরিয়েছে বিলে। খুব সাবধানে তারা নৌকা চালায় যেন এতটুকু শব্দও না হয়। ধানক্ষেত দিয়ে নৌকা চালাতে চালাতে তারা দেখে মতিগঞ্জের সড়কের ওপর একটি লোক মোনাজাতের ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে আছে। হালকা পাতলা একটা লোক। চোখ দুটি বোঁজা। মুখে কগাছি দাড়ি। নৌকা থেকে দেখে মনে হচ্ছে লোকটির যেন চেতনা নেই। কিছুক্ষণ পর লোকটি উত্তর দিকে হেঁটে মহব্বতনগর গ্রামে প্রবেশ করে। এখানেই তাহের-কাদেরের বাড়ি। লোকটিকে তারা বিকেলে গ্রামের জোতদার খালেক ব্যাপারীর বাড়িতে দেখতে পায়। দেখতে পায় তারা নানা বয়সের লোকের সমাগম হয়েছে বৈঠকখানায়।

# ইউনিট ২

## পাঠ ১

**উদ্দেশ্য**

**এ পাঠটি পড়ে আপনি–**

- মহব্বতনগর গ্রামে মজিদের আগমন ও অজ্ঞাত মোদাচ্ছের পীরের মাজার স্থাপন সম্পর্কে একটি বিবরণ লিখতে পারবেন।
- মহব্বতনগর গ্রামের লোকদের জীবনধারা বর্ণনা করতে পারবেন।
- মজিদের বৈষয়িক উন্নতি সম্পর্কে একটি অনুচ্ছেদ লিখতে পারবেন।

| | |
|---|---|
| ☞ | মূল অংশটি ভালো করে পড়ুন এবং ঘটনা ধারা বুঝতে চেষ্টা করুন। কঠিন, অজানা ও আঞ্চলিক শব্দ ও বাক্যরীতি, বাগধারার অর্থ, ব্যাকরণ ইত্যাদির জন্য শব্দার্থ ও টীকা দেখুন। অন্যান্য পাঠগুলো একইভাবে পড়ুন। |

## মূলপাঠ

এ-ভাবেই মজিদের প্রবেশ হলো মহব্বতনগর গ্রামে। প্রবেশটা নাটকীয় হয়েছে সন্দেহ নেই, কিন্তু গ্রামের লোকেরা নাটকেরই পক্ষপাতি। সরাসরি মতিগঞ্জের সড়ক দিয়ে যে গ্রামে এসে ঢুকবে তার চেয়ে বেশি পছন্দ হবে তাকে, যে বিলটার বড় অশ্বত্থ গাছ থেকে নেমে আসবে। মজিদের আগমনটা তেমনি চমকপ্রদ। চমকপ্রদ এ জন্যে যে, তার আগমন, মুহূর্তে সমগ্র গ্রামকে চমকে দেয়। শুধু তাই নয়, গ্রামবাসীদের নির্বুদ্ধিতা সম্পর্কে তাদের সচেতন করে দেয়, অনুশোচনায় জর্জরিত করে দেয় তাদের অন্তর। শীর্ণ লোকটি চীৎকার করে গালাগাল করে লোকদের। খালেক ব্যাপারী ও মাতব্বর রেহান আলী ছিলো। জোয়ান মদ্দ কালু মতি, তারাও ছিলো। কিন্তু লজ্জায় তাদের মাথা হেঁট। নবাগত লোকটির কোটরাগত চোখে আগুন।

–আপনারা জাহেল, বেএলেম, আনপাড়হ্। মোদাচ্ছের পীরের মাজারকে আপনারা এমন করি ফেলি রাখছেন?

গ্রাম থেকে একটু বাইরে একটা বৃহৎ বাঁশঝাড়। মোটাসোটা হলদে তার গুঁড়ি। সেই বাঁশঝাড়ের ক-গজ ওধারে একটা পরিত্যক্ত পুকুরের পাশে ঘন সন্নিবিষ্ট হয়ে আছে গাছপালা। যেন একদিন কার বাগান ছিলো সেখানে। তারই একধারে টালখাওয়া ভাঙ্গা এক প্রাচীন কবর। ছোট ছোট ইটগুলো বিবর্ণ শ্যাওলায় সবুজ, যুগযুগের হাওয়ায় কালচে। ভেতরে সুড়ঙ্গের মত। শেয়ালের বাসা হয়তো। ওরা কী করে জানবে যে, ওটা মোদাচ্ছের পীরের মাজার?

সভায় অশীতিপর বৃদ্ধ সলেমনের বাপও ছিলো। হাঁপানির রোগী। সে দম খিঁচে লজ্জায় নত করে রাখে চোখ।

–আমি ছিলাম গারো পাহাড়ে, মধুপুরগড় থেকে তিন দিনের পথ। –মজিদ বলে। বলে যে, সেখানে সুখে শান্তিতেই ছিলো। গোলাভরা ধান, গরু-ছাগল। তবে সেখানকার মানুষরা কিন্তু অশিক্ষিত, বর্বর। তাদের মধ্যে কিঞ্চিৎ খোদার আলো ছড়াবার জন্যেই অমন বিদেশ-বিভূঁই-এ সে বসবাস করছিলো। তারা বর্বর হলে কী হবে, দিল তাদের সাচ্চা, খাঁটি সোনার মত। খোদা-রসুলের ডাক একবার দিলে পৌঁছে দিতে পারলে তারা বেচাইন হয়ে যায়। তাছাড়া তাদের খাতির যত্ন ও স্নেহ-মমতার মধ্যে বেশ দিন কাটছিলো; কিন্তু সে একদিন স্বপ্ন দেখে। সে-স্বপ্নই তাকে নিয়ে এসেছে এত দূরে। মধুপুর গড় থেকে তিন দিনের পথ সে দুর্গম অঞ্চল মজিদ যে বাড়ি গড়ে তুলেছিলো তা নিমেষের মধ্যে ভেঙ্গে ছুটে চলে এসেছে।

লোকেরা ইতিমধ্যে বার কয়েক শুনেছে সে-কথা,তবু আবার উৎকর্ণ হয়ে ওঠে।

—উনি একদিন স্বপ্নে ডাকি বললেন.....

বলতে বলতে মজিদের কোটরাগত ক্ষুদ্র চোখ দুটো পানিতে ছাপিয়ে ওঠে।

গ্রামের লোকগুলি ইদানীং অবস্থাপন্ন হয়ে ওঠেছে। জোতজমি করেছে, বাড়ি-ঘর করে গরুছাগল আর মেয়েমানুষ পুষে চড়াই-উতরাই ভাব ছেড়ে ধীরস্থির হয়ে ওঠেছে, মুখে চিকনাই হয়েছে। কিন্তু খোদার দিকে তাদের নজর কম। এখানে ধানক্ষেতে হাওয়া গান তোলে বটে কিন্তু মুসল্লীদের গলা আকাশে ভাসে না। গ্রামের প্রান্তে সেই জঙ্গলের মধ্যে কবরের পাশে দাঁড়িয়ে বুকে ঝোলানো তামার দাঁত-খিলাল দিয়ে দাঁতের গহ্বর খোঁচাতে খোঁচাতে মজিদ সেদিন সে কথা স্পষ্ট বুঝেছিলো। সঙ্গে সঙ্গে একথাও বুঝেছিলো যে, দুনিয়ায় সচ্ছলভাবে দু-বেলা খেয়ে বাঁচবার জন্যে যে-খেলা খেলতে যাচ্ছে সে-খেলা সাংঘাতিক। মনে সন্দেহ ছিলো, ভয়ও ছিলো। কিন্তু জমায়েতের অধোবদন চেহারা দেখে পরিষ্কার হয়ে গিয়েছিলো অন্তর। হাঁপানি-রোগগ্রস্ত অশীতিপর বৃদ্ধের চোখের পানে চেয়েও তাতে লজ্জা ছাড়া কিছু দেখে নি।

জঙ্গল সাফ হয়ে গেলো। ইট-সুরকি নিয়ে সেই প্রাচীন কবর সদ্যমৃত কোন মানুষের কবরের মত নোতুন দেহ ধারণ করলো। ঝালরওয়ালা সালু দ্বারা আবৃত হলো মাছের পিঠের মত সে কবর। আগরবাতি গন্ধ ছড়াতে লাগলো, মোমবাতি জ্বলতে লাগলো রাতদিন। গাছপালায় ঢাকা স্থানটি আগে স্যাঁতসেঁতে ছিলো, এখন রোদ পড়ে খটখটে হয়ে উঠলো; হাওয়ার ভাঁপসা গন্ধ খড়ের মত শুষ্ক হয়ে উঠলো।

এ-গ্রাম সে-গ্রাম থেকে লোকরা আসতে লাগলো। তাদের মর্মন্তুদ কান্না, অশ্রুসজল কৃতজ্ঞতা, আশার কথা, ব্যর্থতার কথা সালুতে আবৃত মাছের পিঠের মত অজ্ঞাত ব্যক্তির সেই কবরের কোলে ব্যক্ত হতে লাগলো দিনের পর দিন। তার সঙ্গে পয়সা-ঝকঝকে পয়সা, ঘষা পয়সা, সিকি-দুয়ানি আধুলি, সাচ্চা টাকা, নকল টাকা ছড়াছড়ি যেতে লাগলো।

ক্রমে ক্রমে মজিদের ঘরবাড়ি উঠলো। বাহির ঘর, অন্দর ঘর, গোয়াল ঘর, আওলা-ঘর। জমি হলো, গৃহস্থালী হলো। নিরাকপড়া শ্রাবণের সেই হাওয়া-শূন্য স্তব্ধ দিনে তার জীবনের যে নোতুন অধ্যায় শুরু হয়েছিলো, মাছের পিঠের মত সালু কাপড়ে আবৃত নশ্বর জীবনের প্রতীকটির পাশে সে জীবন পদে পদে এগিয়ে চললো। হয়তো সামনের দিকে, হয়তো কোথাও নয়। সে-কথা ভেবে দেখবার লোক সে নয়। বতোর দিনে মগরা-মগরা ধান আসে ঘরে, তাই যথেষ্ট। তথাকথিত মাজারের পানে চেয়ে ক্বচিৎ কখনো সে যে ভাবিত না হয় তা নয়। কিন্তু তারও যে বাঁচবার অধিকার আছে সেই কথাটাই সে সাময়িক চিন্তার মধ্যে প্রধান হয়ে ওঠে। তাছাড়া গারো পাহাড়ের শ্রমক্লান্ত হাড় বেরকরা দিনের কথা স্মরণ হলে সে শিউরে ওঠে। ভাবে, খোদার বান্দা সে নির্বোধ ও জীবনের জন্য অন্ধ। তার ভুলভ্রান্তি তিনি মাফ করে দেবেন। তাঁর করুণা অপার, সীমাহীন।

## শব্দার্থ ও টীকা

**গ্রামের লোকেরা নাটকেরই পক্ষপাতি** – চমকপ্রদ কোন ঘটনা অত্যন্ত সহজেই গ্রামের সাধারণ লোকদের আকর্ষণ করে। তাই লেখক কিছুটা ব্যঙ্গ করেই বলেছেন গ্রামের লোকেরা নাটকের পক্ষপাতি। **জোয়ান মদ্দ** – যুবক ছেলে। জাহেল (আরবি শব্দ) মূর্খ। **বে-এলেম** – বিদ্যাহীন, লেখাপড়া না জানা। **আনপড়াহ** – যাদের কোন পড়াশোনা নেই। **অশীতিপর** – আশি বছরেরও বেশি বয়সের। **সন্নিবিষ্ট** – সঙ্গে লাগানো, সন্নিহিত। **দম খিঁচে** – নিশ্বাস বন্ধ করে। **সাচ্চা** – পরিষ্কার। **উৎকর্ণ** – সজাগ। **ছাপিয়ে ওঠা** – ভরে ওঠে। **ইদানীং** – আজকাল, সম্প্রতি। **চিকনাই** – উজ্জ্বলতা, সতেজভাব। **নজর** – দৃষ্টি, মনোযোগ। **যে খেলা খেলতে যাচ্ছে** – এখানে 'খেলা' শব্দের অর্থ এক ধরনের প্রতারণা, মিথ্যা ছল-চাতুরি। **জমায়েতের** – সমাবেশের, সভার। **মর্মন্তুদ কান্না** – মর্মভেদকারী কান্না, যে কান্না হৃদয় স্পর্শ করে। অশ্রুসজল **কৃতজ্ঞতা** – চোখের পানিতে ভেজা কৃতজ্ঞতা, গভীর কৃতজ্ঞতা। **বতোর দিনে** – ধান কাটার মৌসুমের দিনে। 'বতর্ শব্দটি কুমিল্লা, রাজশাহী ও খুলনা অঞ্চলে ব্যবহৃত আঞ্চলিক শব্দ। **মগরা মগরা ধান** – মগরা শব্দটি আঞ্চলিক। এখানে ভারে ভারে বা প্রচুর ধান ওঠার অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

## বাগধারা

**মাথা হেঁট হওয়া** – সম্মান ক্ষুণ্ন হওয়া।

**চোখে আগুন** – প্রচণ্ড রাগ।

**চড়াই উতরাই ভাব** – বিক্ষিপ্ত মনোভাব।

**আকাশে ভাসে** – দূরে ছড়িয়ে পড়ে।

## পাঠসংক্ষেপ

মহব্বত নগর গ্রামে প্রবেশ করে মজিদ গ্রামের সবাইকে মধ্যে চমক লাগিয়ে দেয়। সে এসেই প্রথমে তার অব্যর্থ শিকারিসুলভ আচরণে গ্রামবাসীকে তিরস্কার করে। ধর্মে অবহেলার জন্য তাদের গালাগাল করে। গ্রামবাসী মজিদের তিরস্কারে বিমূঢ় ও স্তব্ধ হয়ে যায়। তারা গ্রামের একটু বাইরে পুকুরপাড়ের একটা বড়ো বাঁশঝাড়ের কাছে একটা প্রাচীন পরিত্যক্ত শেওলাধরা কবর দেখেছে বটে, তবে এটা যে কোনো পীরের কবর হতে পারে তা তারা কোনদিন ভাবেনি। কোন এক অচেনা মৌলবী মজিদ এসেই তাদের এ প্রথম জানাল যে এটা মোদাচ্ছের পীরের কবর।

মজিদ জানায় সে ময়মনসিংহের মধুপুরের গারোপাহাড়ে ভালোই ছিল। ওই অঞ্চলের লোকদের মন নরম। তারা আল্লাহ রাসুলের প্রতি শ্রদ্ধাশীল। তারা আল্লাহ রাসুলের নামে বেচাইন হয়ে পড়ে। কিন্তু এতসুখ শান্তি ফেলে সে চলে এসেছে তার কারণ– এক রাতে সে স্বপ্ন দেখেছে মোদাচ্ছের পীর তাকে ডাকছেন। সে ডাকেই সে দৌড়ে এসেছে।

মজিদ মহব্বত নগরে এসেই বুঝে নিয়েছে এ অঞ্চল শস্যশ্যামল, অফুরন্ত সম্ভাবনা আছে এখানে। কিন্তু লোকজন ধর্মকর্মের প্রতি অত মনোযোগী নয়। সুতরাং ওখানেই তাকে ঘা দিতে হবে। মজিদ এও বুঝে, যে মিথ্যার ওপর তার ভিত তৈরি করে যে খেলা খেলছে সেটা খুবই কঠিন খেলা। তবুও তাকে এগুতে হবে। গ্রামের লোকজনের চোখে পানি দেখে সে বুঝেছে তার ওষুধ ধরেছে।

দেখতে না দেখতে দীর্ঘদিনের জঙ্গল সাফ হয়ে গেল। পুকুর পাড়ের সেই অজ্ঞাত-অখ্যাত প্রাচীন জীর্ণ কবর ঝালরওয়ালা লালসালুতে আচ্ছাদিত হয়ে নতুন হয়ে ওঠে। আগরবাতির খুশবু আর মোমবাতির আলোতে ভরে উঠল চারদিক।

এবার কবরের খ্যাতি চারদিকে ছড়িয়ে পড়ল। আশপাশের গ্রাম থেকেও লোকজন আসতে লাগল। এতে মজিদের কবর-বাণিজ্য আস্তে আস্তে চাঙ্গা হয়ে ওঠল। মজিদের ঘর হলো, গৃহস্থালী হলো। অন্দর ঘর, গোয়ালঘর হলো।

## পাঠোত্তর মূল্যায়ন

| | |
|---|---|
| ☞ | নিচের সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্নগুলো পড়ুন ও সম্ভাব্য উত্তর চিন্তা করুন। কিছু প্রশ্নের উত্তর দেয়া আছে- সেগুলো ভাল করে পড়ুন। যে প্রশ্নগুলোর উত্তর দেয়া নেই সেগুলো নিজে নিজে লিখুন। |

**সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্ন**

১. মহব্বত নগর গ্রামে মজিদের নাটকীয়ভাবে প্রবেশের কারণ কী? তার এ প্রবেশের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা লিখুন।

২. 'আপনারা জাহেল, বে এলেম, আনপড়াহ।' এ উক্তি কার। এ উক্তির কারণ কী?

৩. মজিদ মধুপুরে কী অবস্থায় ছিল? তার এ বর্ণনার মধ্যে কতটুকু সত্যতা আছে?

৪. 'খোদার দিকে তাদের নজর কম।' কেন? মজিদ তাদের এ দৃষ্টিভঙ্গি বদলাবার জন্য কী কৌশলে অবলম্বন করেছিল?

৫. 'দুনিয়ায় সচ্ছলভাবে দু-বেলা খেয়ে বাঁচবার জন্যে যে খেলা সে খেলতে যাচ্ছে সে খেলা সাংঘাতিক' মজিদের এ আত্মবিশ্লেষণের মধ্যে 'লালসালু' উপন্যাসের রচয়িতার কোন বক্তব্য কী ধরা পড়েছে?

৬. 'বতোর দিনে', নিরাকপড়া', মগরা মগরা' এ সব শব্দের যথাযথ প্রয়োগ করে বাক্য লিখুন।

৭. 'খোদার বান্দা সে নির্বোধ ও জীবনের জন্য অন্ধ'। এ কথার ব্যাখ্যা লিখুন।

**নমুনা উত্তর**

**প্রশ্ন ঃ উনি একদিন স্বপ্নে ডাকি বল্লেন – উনি কে? কাকে স্বপ্নে ডাকা হল? সেই স্বপ্নই বা কী?**

**উত্তর :** 'লালসালু' উপন্যাসের মজিদের বক্তব্য অনুযায়ী মহব্বতনগর গ্রামের মোদাচ্ছের পীর তাকে স্বপ্ন দেখিয়েছেন– সে যেন মধুপুর ছেড়ে এ গ্রামে চলে আসে। স্বপ্ন বৃত্তান্তের মূল কথা হলো মজিদ এ পরিত্যক্ত বাঁশ ঝাড়ের পাশের কবরটিকে ঝাড়পোছ করে নবরূপ দেবে নিজের জীবনধারণের উপায়টা ভালোভাবে গড়ে নেবে। এ স্বপ্ন মজিদের বানানো মিথ্যা ও অলীক।

## প্রসঙ্গ নির্দেশ করে ব্যাখ্যা লিখুন

| | |
|---|---|
| ☞ | যে ব্যাখ্যাগুলো লিখে দেয়া হয়েছে সেগুলো ভাল করে পড়ুন। বাকিগুলো নিজে নিজে লিখুন। |

**কিন্তু তারও যে বাঁচবার অধিকার আছে সেই কথাটাই সেই সাময়িক চিন্তার মধ্যে প্রধান হয়ে ওঠে।**

সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহর 'লালসালু' উপন্যাস থেকে এ গদ্যাংশটি উৎকলিত হয়েছে। এখানে মজিদের নিজস্ব ভাবনার একটি দিক উদঘাটিত হয়েছে।

মজিদ মধুপুর ছেড়ে নতুন আশায় মহব্বত নগর গ্রামে এসে ওঠেছে। এখানে টিকে থাকা ও স্বচ্ছলভাবে বেঁচে থাকার জন্য যা করা প্রয়োজন, তাই তাকে করতে হবে। এটাই তার মূল সিদ্ধান্ত। নানা দুর্বল চিন্তা তার মনের মধ্যে আসবে। কিন্তু ওসব তো প্রশ্রয় দিলে চলবে না। ওগুলো মাথা থেকে ঝেড়ে ফেলে দিতে হবে।

মজিদ মনে করে পৃথিবীর সবারই বেঁচে থাকার অধিকার আছে। মজিদের মুখ দিয়ে কথাটি বেরোলেও এটি জীবনের একটি গভীর দিক। ন্যায়-অন্যায়, সুনীতি দুর্নীতি ইত্যাদি মূল্যবোধ মানুষেরই সৃষ্টি। কিন্তু স্রষ্টার সৃষ্টিতে বেঁচে থাকার অধিকার সবারই আছে। তাই মিথ্যা প্রতারণার কথা জেনেও মজিদ এ কঠিন দুঃসাহসী কাজে নেমেছে। তার যুক্তি হল মানুষ হিসেবে বাঁচার অধিকার তারও তো আছে।

# পাঠ ২

**উদ্দেশ্য**

**এ পাঠটি পড়ে আপনি–**

- মজিদের বিবাহ পরবর্তী জীবনের অবস্থা সম্পর্কে বলতে পারবেন।
- মজিদের নবপরিণীতা স্ত্রী রহীমার চালচলনের ধরন সম্পর্কে বলতে পারবেন।
- মহব্বত নগর গ্রামের লোকদের সঙ্গে ফসলি জমির সম্পর্ককে মজিদ কোন দৃষ্টি দিয়ে দেখে তা বর্ণনা করতে পারবেন।

## মূলপাঠ

একদিন মজিদ বিয়েও করে। অনেকদিন থেকে আলি-ঝালি একটি চওড়া বেওয়া মেয়েকে দেখছিলো। দেহে যৌবন যেন ব্যাপ্ত হয়ে ছড়িয়ে আছে, বিশাল তার রূপ। দূর থেকে আবছা আবছা তার প্রশস্ত দেহ দেখে শীর্ণ মজিদ জ্বলে ওঠেছিলো।

শেষে সেই প্রশস্ত ব্যাপ্ত যৌবনা মেয়েলোকটিই বিবি হয়ে তার ঘরে এলো। নাম তার রহীমা। সত্যি সে লম্বা চওড়া মানুষ! হাড়-চওড়া মাংসল দেহ। শীঘ্র দেখা গেলো, তার শক্তিও কম নয়। বড় বড় হাঁড়ি সে অনায়াসে এক স্থান থেকে অন্য স্থানে তুলে নিয়ে আসে। হাঁটে যখন, মাটিতে আওয়াজ হয়, কথা কয় যখন, মাঠ থেকে শোনা যায় গলা।

তবে তার শক্তি, তার চওড়া দেহ– যে- দেহ দূর থেকে আলি ঝালি দেখে মজিদের বুকে আগুন ধরেছিলো– তা বাইরের খোলস মাত্র। আসলে সে ঠাণ্ডা, ভীতু মানুষ। দশ কথায় রা নেই, রক্তে রাগ নেই। মজিদের প্রতি তার সম্মান, শ্রদ্ধা ও ভয়। শীর্ণ মানুষটির পেছনে মাছের পিঠের মত মাজারটির বৃহৎ ছায়া দেখে।

ও যখন উঠানে হাঁটে তখন মজিদ চেয়ে চেয়ে দেখে। তারপর মধুর হেসে আস্তে মাথা নেড়ে বলে,

—অমন করি হাঁটতে নাই।

থমকে গিয়ে রহীমা তার দিকে তাকায়।

মজিদ বলে,

—অমন করে হাঁটতে নাই বিবি, মাটি-এ গোস্বা করে। এ মাটিতেই তো একদিন ফিরি যাইবা—থেমে আবার বলে, মাটিরে কষ্ট দেওন গুণাহ্।

এ-কথা আগেও শুনেছে রহীমা। মুরুব্বিরা বলেছে, বাড়ির আত্মীয়ারা বলেছে। মজিদের কথার বাইরে সালু কাপড়ে আবৃত মাজারটির কথা স্মরণ হয়।

মজিদ নীরবে চেয়ে চেয়ে দেখে। দেখে রহীমার চোখে ভয়। মধুরভাবে হেসে আবার বলে,

—অমন করি কখনো হাঁটিও না। কবরে আজাব হইব।

শক্তিমত্তা নারীর উজ্জ্বল পরিষ্কার চোখে ঘনায়মান ভয়ের ছায়া দেখে মজিদ খুশি হয়। তারপর বাইরে গিয়ে কোরান তালাওয়াৎ শুরু করে। গলা ভালো তার,পড়বার ভঙ্গিও মধুর। একটা চমৎকার সুরে সারা বাড়ি ভরে যায়। যেন হাস্নাহানার মিষ্টি মধুর গন্ধ ছড়ায়।

কাজ করতে করতে রহীমা থমকে যায়; কান পেতে শোনে। খোদাতা'আলার রহস্যময় দিগন্ত তার অন্তরে যেন বিদ্যুতের মত থেকে থেকে ঝিলিক দিয়ে ওঠে। একটি অব্যক্ত ভীতিও ঘনিয়ে আসে মনে। সে খোদাকে ভয় পায়, মাজারকে ভয় পায়, স্বামী মজিদকে ভয় পায়।

পুকুরে গোসল করে সিক্ত বসনে উঠানে দাঁড়িয়ে রহীমা যখন চুল ঝাড়ে তখনো চেয়ে চেয়ে দেখে মজিদ। বিছানার পাশে যে-দেহটির তাল পায় না, সে দেহটিই এখন সিক্ত কাপড় ভেদ করে অদ্ভুত সুন্দর হয়ে ওঠে। তার চোখ চকচক করে। কিন্তু রহীমার চেতনা নেই।

গলা কেশে মজিদ বলে,

—খোলা জাগায় অমন বেশরমের মত দাঁড়াইও না বিবি।

সচকিত হয়ে রহীমা হাত নামায়, বুকে ভালো করে আঁচল দেয়, পেছনে সাপ্টে থাকা কাপড় আলগা করে দিয়ে এধার-ওধার যেন বেগানা-বেগায়ের লোকের সন্ধানে তাকায়। কিন্তু ঐ তো কেবল মজিদ বসে আছে দরজার পাশে, হাতে হুকা। গলাসীসার মত অবশেষে লজ্জা আসে রহীমার সারা দেহে। দ্রুত পায়ে সে আড়ালে চলে যায়।

মজিদের সামনে এমনভাবে আর দাঁড়ায় না কখনো।

গ্রামের লোকেরা যেন রহীমারই অন্য সংস্করণ। তাগড়া-তাগড়া দেহ-চেনে জমি আর ধান, চেনে পেট। খোদার কথা নেই। স্মরণ করিয়ে দিলে আছে, নচেৎ ভুল মেরে থাকে। জমির জন্যে প্রাণ। সে-জমিতে বর্ষণহীন খরার দিনে ফাটল ধরলে তখন কেবল স্মরণ হয় খোদাকে।

কিন্তু জমি এধারে উর্বর, চারা ছড়িয়েছে কি সোনা ফলবে। মানুষরাও পরিশ্রম করে, জমিও সে শ্রমের সম্মান দেয়। দেয় তো বুক উজাড় করে দেয়।

মাঠে গিয়ে মানুষ মেঠো হয়ে ওঠে। কখনো ঘরোয়া হিংসা-বিদ্বেষের জন্যে, বা আত্মমর্যাদার ভুয়ো ঝান্ডা উঁচিয়ে রাখবার জন্যে তারা জমিকে দাবার ছকের মত ভাগ করে ফেলে। সে জমিকেই আবার রক্ত দিয়ে রক্ষা করতে দ্বিধা করে না। হয়তো দুনিয়ার দূষিত আবহাওয়ার মধ্যে তারা বর্বরতার নীচতায় নেমে আসে, কিন্তু যখন জমির গন্ধ নাকে লাগে, মাটির এলো খাবড়া দলাগুলোর পানে চেয়ে আপন রক্তমাংসের কথা স্মরণ হয়, তখন ভুলে যায় সমস্ত হিংসা-বিদ্বেষ। সিপাইর খণ্ডিত ছিন্ন দেহের একতাল অর্থহীন মাংসের মত জমিও তখন প্রাণের চাইতে বড় হয়ে ওঠে। খাবলা খাবলা

রুঠাজমি, ডোবাজমি, কাদাজমি-ফাটলধরা জ্যৈষ্ঠের জমি—সব জমি একান্ত আপন; কোনটার প্রতি অবহেলা নেই। যেমন সুস্থ মুমূর্ষু বা জরাজর্জর আত্মজনের প্রতি দৃষ্টিভেদ থাকে না মানুষের। মাথার ঘাম পায়ে ফেলেই তারা খাটে। হয়তো কাঠফাটা রোদ, হয়তো মুষলধারে বৃষ্টি—তারা পরিশ্রম করে চলে। অগ্রহায়ণের শীত খোলামাঠে হাড় কাঁপায়, রোদ পানি-খাওয়া মোটা কর্কশ ত্বকের ডাসা লোমগুলো পর্যন্ত জলো শীতল হাওয়ায় খাড়া হয়ে ওঠে—তবু কোমর পরিমাণ পানিতে ডুবে থাকা মাঠ সাফ করে। সযত্নে, সস্নেহে সাফ করে যত জঞ্জাল। কিন্তু জঞ্জালের আবার শেষ নেই। কার্তিকের পানি সরে এলেও কচুরিপানা জড়িয়ে জড়িয়ে থাকে জমিতে। তখন আবার দল বেঁধে লেগে যায় তারা। ভাগ্যকে ঘষে সাফ করবার উপায় নেই, কিন্তু যে-জমি জীবন সে জমিকে জঞ্জালমুক্ত করে ফসলের জন্যে তৈরি করে। তার জন্যে অক্লান্ত পরিশ্রমকে ভয় নেই। এদিকে সূর্য ক্রমশ দূরপথ ভ্রমণে বেরোয়, ঝিমিয়ে আসে তাপ, মেঘশূন্য আকাশের জমাট ঢালা নীলিমার মধ্যে শুকিয়ে ওঠে দিগন্তবিস্তৃত মাঠ। তখন শুরু হয় আরেক দফা পরিশ্রম। রাত নেই দিন নেই হাল দেয়। তারপর ছড়ায় চারা—ছড়াবার সময় না-তাকায় দিগন্তের পানে, না-স্মরণ করে খোদাকে। এবং খোদাকে স্মরণ করে না বলেই হয়তো চারা ছড়ানো জমি শুকিয়ে কঠিন হতে থাকে। রোদ চড়া হয়ে আসে, শূন্য আকাশ বিশাল নগ্নতায় নীল হয়ে জ্বলেপুড়ে মরে। নধর নধর হয়ে ওঠা কচি কচি ধানের ডগার পানে চেয়ে বুক কেঁপে ওঠে তাদের। তারা দল বেঁধে আবার ছোটে। তারপর রাত নেই দিন নেই বিল থেকে কোঁদে কোঁদে পানি তোলে। সামান্য ছুতোয় প্রতিবেশীর মাথায় দা বসাতে যাদের বিন্দুমাত্র দ্বিধা হয় না, তাদেরই বুক বিমর্ষ আকাশের তলে কচি-নধর ধান দেখে শঙ্কিত হয়ে ওঠে, মাটির তৃষ্ণায় তাদেরও অন্তর খাঁ খাঁ করে। রাত নেই দিন নেই, কোঁদে করে পানি তোলে—মন-কে মন।

এত শ্রম এত কষ্ট, তবু ভাগ্যের ঠিকঠিকানা নেই। চৈত্রের শেষ দিক বা বৈশাখের শুরু। ধান ওঠে-ওঠে, এমন সময়ে কোন এক দুপুরে কালো মেঘের সাথে আসে ঝড়, আসে শিলাবৃষ্টি, হয়তো না বলে না কয়ে নিমেষের মধ্যে ধ্বংস করে দিয়ে যায় মাঠ। কোচবিদ্ধ হয়ে নিহত ছমিরুদ্দিনের রক্তাপ্লুত দেহের পানে চেয়ে আবেদ-জাবেদের মনে দানবীয় উল্লাস হতে পারে, কিন্তু এখন তারা পাথর হয়ে যায়। যার একরত্তি জমিও নেই, তারও চোখ ছলছল করে ওঠে। এবং হয়তো তখন খোদাকে স্মরণ করে, হয়তো করে না।

মাঠের প্রান্তে একাকী দাঁড়িয়ে মজিদ দাঁত খেলাল করে আর সে-কথাই ভাবে। কাতারে কাতারে সারবন্দি হয়ে দ্বিতীয়ার চাঁদের মত কাস্তে নিয়ে মজুররা যখন ধান কাঠে আর বুক ফাটিয়ে গীত গায় তখনো মজিদ দূরে দাঁড়িয়ে দেখে আর ভাবে। গলার তামার খিলাল দিয়ে দাঁতের গহ্বর গুতোয় আর ভাবে। কিসের এত গান, এত আনন্দ? মজিদের চোখ ছোট হয়ে আসে। রহীমার শরীরেতো এদেরই রক্ত, আর তার মতই এরা তাগড়া গাট্টাগোট্টা ও প্রশস্ত। রহীমার চোখে ভয় দেখেছে মজিদ। এরা কি ভয় পাবে না? ওদের গান আকাশে ভাসে, ঝিলমিল করতে থাকা ধানের শিষে এদের আকর্ণ হাসির ঝলক লাগে। ওদের খোদার ভয় নেই। মজিদও চায়, তার গোলা ভরে উঠুক ধানে। কিন্তু সে তো জমিকে ধন মনে করে না, আপন রক্তমাংসের সামিল খেয়াল করে না? শ্যেন দৃষ্টিতে অবশ্যি চেয়ে চেয়ে দেখে ধানকাটা; কিন্তু তাদের মত লোম-জাগানো পুলক লাগে না তার অন্তরে। হাসি তাদের প্রাণ, এ কথা মজিদের ভালো লাগে না। তাদের গীত ও হাসিও ভালো লাগে না। ঝালরওয়ালা সালু কাপড়ে আবৃত মাজারটিকে তাদের হাসি আর গীত অবজ্ঞা করে যেন।

জমায়েতকে মজিদ বলে, খোদাই রিজিক দেনেওয়ালা।

শুনে, সালুকাপড়ের ঢাকা রহস্যময়, চিরনীরব মাজারের পাশে তারা স্তব্ধ হয়ে যায়।

মজিদ বলে, মাঠভরা ধান দেখে যাদের মনে মাটির প্রতি পূজার ভাব জাগে তারা বুত-পূজারী। তারা গুণাগার। জমায়েত মাথা হেঁট করে থাকে!

বতোর দিন ঘুরে আসে, আবার পেরিয়ে যায়। মজিদের জমিজোত বাড়ে, সঙ্গে সঙ্গে সম্মানও বাড়ে। গাঁয়ের মাতব্বর ওর কথা ছাড়া কথা কয় না; সলাপরামর্শ, আদেশ-উপদেশ, নছিহতের জন্যে তার কাছেই আসে, চিরনীরব সালু কাপড়ে আবৃত মাজারের মুখপাত্র হিসেবে তার কথা সাগ্রহে শোনে, খরা পড়লে তারই কাছে ছুটে আসে খতম পড়াবার জন্যে। খোদা রিজিক দেনেওয়ালা এ কথা তারা আজ বোঝে। মাঠের বুকে গান গেয়ে গজব কাটানো যায় না, বোঝে। মজিদও আত্মবিশ্বাস পায়।

## শব্দার্থ ও টীকা

**বেওয়া** – সন্তানহীনা বিধবা। **আবছা আবছা** – অস্পষ্ট। যা পরিষ্কারভাবে দেখা যায় না। **শীর্ণ** – চিকন, সরু। **প্রশস্ত ব্যাপ্ত যৌবনা** – যার যৌবন উপচে পড়ছে। **হাড় চওড়া** – শক্ত দেহের বাঁধন। **গোঁয়ার** – এক রোখা স্বভাবের। **গোস্বা** – রাগ (ফারসি শব্দ)। **গুণাহ** – পাপ(ফারসি শব্দ)। **কবর আজাব** –কবরে শাস্তি। **শক্তিমত্তা** – প্রচণ্ড শক্তি, গায়ের জোর। **ঘনায়মান** – যা চোখের সামনে ঘনিয়ে আসছে। **হ্লাহেনার মিষ্ট মধুর গন্ধ ছড়ায়** – মজিদের সুরেলা কুরআন তেলাওয়াতের মধ্যে মিষ্টি মধুর সুরের হাওয়া বইছিল লেখক তাকে যথার্থভাবে হাস্নাহেনা ফুলের স্নিগ্ধ খুশবুর সঙ্গে তুলনা করেছেন। **খোদা তালার রহস্যময় দিগন্ত তার অন্তরে যেন বিদ্যুতের মত থেকে থেকে ঝিলিক দিয়ে ওঠে** – মজিদের কুরআন তেলায়াতের ফলে এবং মাজারের রহস্যময় পরিবেশে তার প্রভাব পড়ার আলোকে মজিদের যুবতী স্ত্রী রহীমার মনে দারুন প্রতিক্রিয়া হয়। রহীমার মনের এ প্রতিক্রিয়াকে ঔপন্যাসিক বিদ্যুতের আলোর ঝলকের সঙ্গে তুলনা করেছেন। **অব্যক্ত** – অপ্রকাশিত। **তাল পায় না**– কোন কূল কিনারা পায় না, হদিস পায় না। **বেশরম** – নির্লজ্জ। **বেগানা - বেগায়ের** – অনীপ্সা, অপরিচিত। **তাগড়া-তাগড়া** – মোটা তাজা, শক্তিশালী। **আত্মমর্যাদার ভুয়োঝান্ডা উঁচিয়ে রাখবার জন্য** – গ্রামে জমিজমার অধিকারের সঙ্গে মর্যাদার সম্পর্ক অত্যন্ত বেশি। তাই জমির প্রতি টান ও জমিকে ধরে রাখার জন্য প্রাণপাত করতেও তাদের দ্বিধা নেই। জমির অধিকারের এ আত্মর্যাদাকে ঔপন্যাসিক 'ঝাণ্ডা' বা পতাকার সঙ্গে তুলনা করেছেন। নিজের ভূখণ্ডে পতাকা উচিয়ে রাখার মত এটা অত্যন্ত মর্যাদাপূর্ণ। তবে এ আত্মর্যাদার মধ্যে কিছুটা প্রবঞ্চনাও আছে। তাই লেখক এটাকে 'ভূয়ো' বা -- নিরর্থক বলেছেন। **দলাগুলো** – মাটির ঢেলা। **সিপাইর খণ্ডিত** – ছিন্ন দেহের একতাল অর্থহীন। **মাংসের মত** – ঔপন্যাসিক জমির ঢেলা ঢেলা মাটির খণ্ডকে অত্যন্ত অর্থপূর্ণভাবে যুদ্ধক্ষেত্রে সৈনিকের টুকরো টুকরো একত্রিত মাংসখণ্ডের সঙ্গে তুলনা করেছেন। কারণ এ মাটির ঢেলার জন্যও যুদ্ধ হয়, হানাহানি হয়, প্রাণপাত হয়। **রুঠা জমি** – নিস্ফলা জমি। অনুর্বর জমি। **আকাশ বিশাল নগ্নতায় জলেপুড়ে মরে** – মেঘ বৃষ্টি হীন নীল আকাশকে লেখক এ উপমায় চিত্রিত করেছেন। **পাথর হয়ে যায়** – নির্বাক ও স্তব্ধ হয়ে যায়। **দ্বিতীয়ার চাঁদের মতো কান্তে** – সরু চিকন কান্তে। গাট্টাগোট্টা – শক্ত বাঁধুনিতে গড়া শরীর। **অবজ্ঞা** – অমর্যাদা, বিদ্রূপ। **খরাপড়া** – অনাবৃষ্টি দেখা দেয়া। **খতম পড়াবার জন্য** – গ্রামে যখন অনাবৃষ্টি বা কোন বিপদ আপদ দেখা দেয় ধর্মপ্রাণ মুসলমানরা পবিত্র কুরআন পড়াবার ব্যবস্থা করে। কুরআনের ৩০ অধ্যায় পড়ে শেষ করাকে কোরান খতম করা বলে। এর মধ্যে যে মঙ্গল ও কল্যাণ বয়ে আসবে এটাই ধর্মপ্রাণ মানুষের বিশ্বাস। **বুত পূজারী** – মূর্তি পূজক। **নছিহত** – উপদেশ। **রিজিক দেনেওয়ালা** – খাদ্য যোগানদানকারী।

## পাঠসংক্ষেপ

মহব্বত নগর গ্রামে মজিদ নিজের অবস্থানকে সুসংহত করে নেয়। তারপর যৌবনদীপ্ত এক গ্রাম্য তরুণীকে বিয়ে করে। তার নাম রহীমা। রহীমার চাল-চলন একটু বেসামাল। মজিদ এজন্য তাকে খোদার ভয় দেখায়, সুরেলা কুরআন তেলোয়াত করে তার মনে প্রভাব বিস্তার করে। 'লালসালু' আবৃত মাজারটিও রহীমার মনে এক ধরনের রহস্যময় ভয়ের সঞ্চার করে।

মজিদ সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে যখন তাকায় তখন দেখে গ্রামের লোকগুলো ও রহীমার মতোই। তাদের মধ্যে খোদার ভয় কম। জমিতে ফসল ফললেই তারা খুশি। জমি ছাড়া তারা কিছু চেনে না। জমিই তাদের সম্মান ও প্রতিপত্তির ধারক বলে তারা মনে করে। এ জন্য একখণ্ড জমির জন্য তারা প্রাণ দিতেও দ্বিধা করেনা। খরার সময় জমি শুকিয়ে যায়। খোদাকে ভুলে থাকার জন্য তাদের ওপর নানা বিপদ এসে পড়ে। গ্রামের মানুষের এত পরিশ্রম। তবুও তাদের ভাগ্যের ঠিক ঠিকানা নেই। মজিদ এ ধরনের অবস্থায় মনে মনে উদ্বেগ ও চিন্তায় আচ্ছন্ন হয়। সে দাঁত খিলাল করতে করতে ভাবে রহীমাও ফসলের প্রাচুর্য ভালবাসে। কিন্তু লোকদের মতো ধানকে রক্তমাংসের মতো মূল্যবান মনে করে না। খরার পর, পানি সেচার ফলে যখন প্রচুর ধান জন্মে, গ্রামের মানুষ হাসতে হাসতে গান গাইতে গাইতে ধান কাটতে যায়। তখন এ দৃশ্য মজিদের ভাল লাগে না। তখন তার চোখে ভেসে ওঠে 'লালসালু'তে ঢাকা কবর। কারণ এটাইত তার প্রধান সম্পদ।

মজিদ গ্রামের লোকদের বলে ফসলের মাঠে ধান দেখে যারা ভক্তি শ্রদ্ধায় নত হয়। তারা মূলত মূর্তি পূজক। তার কথায় কাজ হয়। গ্রামের লোক লালসালুর কবরের কাছে আবার আসে। সে আশ্বিশ্বাস খুঁজে পায়।

## পাঠোত্তর মূল্যায়ন

| | |
|---|---|
| ☞ | নিচের সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্নগুলো পড়ুন ও সম্ভাব্য উত্তর চিন্তা করুন। কিছু প্রশ্নের উত্তর দেয়া আছে- সেগুলো ভাল করে পড়ুন। যে প্রশ্নগুলোর উত্তর দেয়া নেই সেগুলো নিজে নিজে লিখুন। |

**সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্ন**

১. মজিদ তার স্ত্রী রহীমাকে কোন দৃষ্টিতে দেখে? রহীমার চালচলনের তার শাসনের কারণ কি?

২. 'মাটি-এ গোস্বা করে'। – এ কথার তাৎপর্য কী ? এ উক্তির পেছনে গূঢ় উদ্দেশ্য কি?

৩. মজিদ কখন রহীমার প্রতি গুরু গম্ভীর হয়ে পড়ে? তার কারণ কি?

৪. কারা জমিকে দাবার ছকের মতো ব্যবহার করে? এ জমির প্রতি গ্রামের মানুষের এত নিবিড় সম্পর্ক ও ভালোবাসা কেন?

৫. মুমূর্ষু যেমন সুস্থ মানুষের বা জরাজীর্ণ আশ্বি জনের প্রতি দৃষ্টিভেদ থাকে না মানুষের।' –কোন প্রসঙ্গে এ উপমা দেয়া হয়েছে? এ উপমার তাৎপর্য বিশ্লেষণ করুন।

৬. 'মাঠভরা ধান দেখে যাদের মনে মাটির প্রতি পূজার ভাব জাগে তারা বুত পূজারী। তারা গুণাহগার।' – মজিদের এ উক্তি বিশ্লেষণ করুন।

৭. মজিদ কখন আশ্বিশ্বাস ফিরে পায় – আলোচনা করুন।

**নমুনা উত্তর**

**প্রশ্ন ঃ 'মাঠভরা ধান দেখে যাদের মনে মাটির প্রতি পূজার ভাব জাগে তারা বুত পূজারী। তারা গুণাহগার।' – মজিদের এ উক্তি বিশ্লেষণ করুন।**

**উত্তর :** মজিদ মহব্বত নগর গ্রামে এসে লক্ষ করেছে গ্রামের লোকদের কাছে জমিই হল প্রাণ। কচি ধানে যখন জমি দেখা দেয় তারা গান গায়, ভুলে যায় খোদাকে। জমির জন্য তারা সব কষ্ট করতে রাজি। সে তুলনায় তারা ধর্মমুখী নয় যতটুকু তারা কর্মমুখী। খরার সময় এটা আরও প্রকট হয়ে ধরা পড়ে। তখন তারা অক্লান্ত পরিশ্রম করে, জমিতে পানি দিয়ে ফসল ফলায়। গান গাইতে গাইতে সরু কাস্তে নিয়ে ফসলের মাঠে ছুটে। তখন খোদাকে স্মরণ করে না। 'লালসালু'র মাজারের দিকে তাকায় না। মজিদ নিজের স্বার্থেই ভাবে এটা ভাল লক্ষণ নয়। তাই তাদের মনে ভয় ধরিয়ে দেয়ার জন্য সে ধর্মের দোহাই দিয়ে বলে জমিতে ধান দেখে যাদের মনে আনন্দ ফূর্তি হয় তারা পাপী, তারা মূর্তিপূজক।

# পাঠ ৩

**উদ্দেশ্য**

**এ পাঠটি পড়ে আপনি–**

- খৎনা প্রসঙ্গ বর্ণনা করতে পারবেন।
- রহীমা চরিত্রের কিছু বৈশিষ্ট্য ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

## মূলপাঠ

মজিদ সাত ছেলের বাপ দুদু মিঞাকে প্রশ্ন করে,

—কলমা জানো মিঞা?

ঘাড় গুজে আধাপাকা মাথা চুলকায় দুদু মিয়া। মুখে লজ্জার হাসি।

গর্জে ওঠে মজিদ বলে,

—হাসিও না মিঞা!

থতমত খেয়ে হাসি বন্ধ করে দুদু মিঞা।

সাত ছেলের এক ছেলে সঙ্গে এসেছিলো। সে বাপের অবস্থা দেখে খিলখিল করে হাসে। বাপের মাথা নত করে থাকার ভঙ্গিটা যেন গাধার ভঙ্গির মত হয়ে ওঠেছে। চোখ কিন্তু তার পিটপিট করে। বলে,

—আমি গরীব মুরুক্ষু মানুষ।

খোদাকে হয়তো সে জানে। কিন্তু জ্বলন্ত পেটের মধ্যে সব কিছু যেন বাষ্পহয়ে মিলিয়ে যায়। ভেতরে গনগনে আগুন, সব উড়ে যায়, পুড়ে যায়। আজ লজ্জায় মাথা নত করে রাখে—গাধার মত পিঠে-ঘাড়ে সমান।

এবার খালেক ব্যাপারী ধমকে ওঠে,

—কলমা জানস্ না ব্যাটা?

সে আর মাথা তোলে না। ছেলেটা হাসে।

খালেক ব্যাপারী একটি মক্তব দিয়েছে। এরই মধ্যে একপাল ছেলে-মেয়ে জুটে গেছে। ভোরে যখন কলতান করে আমসিপারা পড়ে তখন কখনো মজিদের মনে স্মৃতি জাগে। শৈশবের স্মৃতি—যে দেশ ছেড়ে এসেছে, যে শস্যহীন দেশ তার জন্মস্থান —সেখানে একদা এক মক্তবে এ রকম করে সে আমসিপারা পড়তো।

অবশেষে মজিদ আদেশ দেয়।

—ব্যাপারীর মক্তবে তুমি কল্মা শিখবা। ঘাড় নেড়ে তখুনি রাজি হয়ে যায় লোকটি। শেষে মুখ তুলে বোকার মত বলে,

—গরীব মানুষ, খাইবার পাই না।

লোকটির মাথায় যেন ছিট। যত্রতত্র কারণে-অকারণে না খেতে পাওয়ার কথাটি শোনানো অভ্যাস তার। শুনিয়ে হয়তো মানুষের সমবেদনা আকর্ষণ করার চেষ্টা করে। কিন্তু লোকে খেতে পায়, পায় না; এতে সমবেদনার কী আছে? প্রশ্ন থাকলে তো সমবেদনা থাকবে। ও কী করে অমন গাধার মত ঘাড়-পিঠ সমান করতে পারে সে কথা তো কেউ জিজ্ঞেস করে না। দৃশ্যটি অবশ্য উপভোগ করে।

মজিদের পক্ষ থেকে খালেক ব্যাপারী ধমকে বলে,

—হইছে হইছে, ভাগ্।

একদিন ধাড়িধাড়ি ছেলে কয়েকটি পাকড়াও করে মজিদ।

—কীরে ব্যাটা, খৎনা হইছে?

একটি ছেলে আরেকটিকে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে বলে,

—অর অয় নাই।

সে রেগে বলে, —অরও অয় নাই।

শুনে আগুন হয়ে যায় মজিদ। বলে, পরশুদিন জুম্মাবার, সেদিন যদি দুজনেরই একসাথে খৎনা না হয় তবে মুশ্কিল হবে।

একবার একটি ছেলে বলে,

—হেই কবে আমার খৎনা হইছে।

তারপর বাপও মাথা নেড়ে সায় দেয়,

—ছোট থাকতেই খৎনা দিছি। মিছা কথা না হুজুর।

কিন্তু মজিদ বিশ্বস্তসূত্রে শুনেছে, ছেলেটির খৎনা হয়নি। গর্জন করে ওঠে বলে,

—তোল্ লুঙ্গি?

বাপ আবার বলে, খোদার কসম, ওর খৎনা হইছে। কিন্তু তার কথায় কান না দিয়ে মজিদ বিদ্যুৎবেগে ছুটে গিয়ে ধাঁ করে তুলে ফেলে তার লুঙ্গি। ছেলেটি পালাবার উপক্রম করছিলো, থাবা দিয়ে তার ঘাড় ধরে ফেলে মজিদ। বাপও পালাই পালাই করছিলো, কিন্তু কীভাবে পালায় ভেবে না পেয়ে ওখানেই বোকার মত চোখ মেলে বসে থাকে। খানিকক্ষণ বাপ-পুতকে একসঙ্গে গালাগাল করে ছেলেটিকে ধরে নিয়ে এসে মজিদ নিজের বাইরের ঘরে খুঁটির সঙ্গে বেঁধে রাখে। বলে,

—আইজ নামাজের পর আমিই তোর খৎনা দিমু।

দাড়িগোঁফ ওঠা মদ্দের মত ছেলে ঠির ঠির করে কাঁপতে থাকে। বাপের মুখে রা নেই। শুকিয়ে সে-মুখ আমসি হয়ে গেছে।

সারাটি দুপুর কোরবানীর ছাগলের মত খুঁটিবন্দি হয়ে থাকে ছেলেটি। আছরের নামাজের পর মজিদ ছুরি-তেনা নিয়ে আসতেই সে তারস্বরে আর্তনাদ করে ওঠে কান্না জুড়ে দেয়। দেখে বাপের আর সয় না, সেও হাউ-মাউ করে কেঁদে ওঠে। বাইরে লোক জমে গিয়েছিল। খালেক ব্যাপারীও এসেছিলো ব্যাপার দেখতে। তারা ধমকাতে থাকে বাপকে।

দাঁত কড়মড় করে মজিদের। মাঠে শয়তানের মত গান যখন ধরে, তখন খোদার কথা আর মনে হয় না? বুড়ো ধামড়া ছেলে, খৎনা হয়নি। ভাবতেও কেমন লাগে। তওবা, তওবা! ব্যাপারীকে শুনিয়ে মজিদ বলে,

—আপনাগো দেশটা বড় জাহেলের দেশ।

ছেলের কান্না থামে না। মজিদ যখন বাঁশের কঞ্চি ছিলছে তখন সে আরেকবার তারস্বরে আর্তনাদ করে ওঠে বলে,

—আমার বাপেরও খৎনা অয় নাই—তানারে আগে দেন।

মজিদ বিস্ময়ে হতভম্ব। খালেক ব্যাপারীর পানে চেয়ে কয়েক মুহূর্ত নিষ্পলক হয়ে থাকে, মুখে ভাষা জোগায় না। লজ্জায় ব্যাপারীর কান পর্যন্ত লাল।

আধ ঘন্টার মধ্যে দু-দুটো খৎনা হয়ে গেলো। ব্যাপারটা ঠিক হাটবাজারের মধ্যে যেন হলো। কারণ বাপ-বেটাকে ধরবার জন্যে লোকের প্রয়োজন ছিলো বলে, এবং এসব দৃশ্য না দেখে থাকা যায় না বলে ঘরটায় ভিড় জমে গিয়েছিলো। শুধু তাই নয়, পেছনে বেড়ার ফুটো দিয়ে দেখলো পাড়ার যত মেয়েরা—ছুকড়ি, জোয়ান, বুড়ি। রহীমা পর্যন্ত না দেখে পারলো না। স্বামীর কীর্তিতে উজ্জ্বল হয়ে ওঠা চোখে অন্য মেয়েদের সঙ্গে সেও মুখে আঁচল দিয়ে খানিকটা হাসলো।

সে-রাতে দোয়া-দরুদ সেতো মাজারঘর থেকে বেরিয়ে এসে বাঁ পাশের খোলা মাঠের পানে তাকিয়ে মজিদ কতক্ষণ চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকে। দিগন্ত-বিস্তৃত হয়ে যে মাঠ দূরে আবছাভাবে মিলিয়ে গেছে সেখান থেকে তারার রাজ্য। ওধারে গ্রামে নিস্তব্ধ। দু-একটা পাড়ায় কেবল কুত্তা ঘেউ ঘেউ করে।

নীরবতার মধ্যে হঠাৎ মজিদ একটা শক্তি বোধ করে অন্তরে। মহব্বতনগর গ্রামে সে শক্তির শিকড় গেড়েছে। আর সে-শক্তি শাখাপ্রশাখা মেলে সারা গ্রামকে আচ্ছন্ন করে লোকদের জীবনকে জড়িয়ে ধরেছে সবলভাবে। প্রতিপত্তিশালী খালেক ব্যাপারী আছে বটে, কিন্তু তার শক্তিতে আর মজিদের শক্তিতে প্রভেদ আছে। আজ অপরাহ্নে যে-দুটি লোককে মজিদ কষ্ট দিয়েছে তারা নির্ভেজাল কষ্টই পেয়েছে। সে-কষ্ট পাওয়ার পেছনে ক্রোধ নেই, দ্বেষ নেই। আজ সেই লোকদেরই খালেক ব্যাপারী চাবুক মারুক, প্রতিপত্তির ভয়ে তারা মুখে রা না-করলেও অন্তরে ঘনিয়ে উঠবে দ্বেষ, প্রতিহিংসার আগুন। মজিদের শক্তি ওপর থেকে আসে, আসে ঐ সালু কাপড়ে আবৃত মাজার থেকে। মাজারটি তার শক্তির মূল।

মজিদের সে-শক্তি প্রতিফলিত হয় রহীমার ওপর। মেয়েমানুষরা আসে তার কাছে। এ-গ্রামেরই মেয়ে রহীমা। ছোটবেলায় নাকে নোলক পরে হলদে শাড়ি পেঁচিয়ে পরে ছুটোছুটি করতো– সবার মনে সে-ছবি এখনো স্পষ্ট। প্রথম বিয়ের সময় তারা তাকে দেখেছে, স্বামীর মৃত্যুর পরও তাকে দেখেছে। কিন্তু ওরাই আজ এসে চেনে না। কথা কয় অন্যভাবে, গলা নরম করে সুপারিশের জন্যে ধরে। খিড়কির দরজা দিয়ে আসে তারা, এসে সন্তর্পণে কথা কয়। কাঁদলেও চেপে চেপে কাঁদে। বাইরে মাজার যেমন রহস্যময় তাদের কাছে, মজিদও তেমনি রহস্যময়।

মজিদ ধরা-ছোঁয়ার বাইরে। যোগসূত্র হচ্ছে রহীমা। রহীমা শোনে তাদের কথা। কখনো হৃদয় গলে আসে অপরের দুঃখের কথা শুনে, কখনো ছলছল করে ওঠে চোখ। গভীর রাতে কখনো মাজারের ধারে গিয়ে দাঁড়িয়ে নির্নিমেষ চোখে তাকিয়ে থাকে মাছের পিঠের মত স্তব্ধ, বিচিত্র সেই মাজারের পানে। মাথায় কপাল পর্যন্ত ঘোমটা টানা, দেহ নিশ্চল। তাকিয়ে থাকতে থাকতে ঘোর লাগে, চোখ অবশ হয়ে আসে, মহাশক্তির কাছে পাছে কোন বেয়াদবি করে বসে সে-ভয়ে বুক কেঁপে ওঠে কখনো। তবু মুহূর্তের পর মুহূর্ত মূর্তির মত দাঁড়িয়ে থাকে। ভাবে, কোন্ মারুফ ওখানে ঘুমিয়ে আছেন–যাঁর রুহ এখনো মানুষের দুঃখ যাতনায় কাঁদে, তাদের মঙ্গলের জন্যে আকুল হয়ে থাকে সদাসর্বদা?

কখনো কখনো অতি সঙ্গোপনে রহীমা একটা আর্জি জানায়। বলে, তার সন্তান নেই; সন্তানশূন্য কোলটি খাঁ-খাঁ করে। তিনি তাকে যেন একটি সন্তান দেন। আর্জি জানায় চোখের আকুলতায়, এদিকে ঠোঁট পর্যন্ত কাঁপে না। অতি গোপন মনের কথা শিশুর সরলতায়, সালু কাপড়ে ঢাকা রহস্যময় মাজারের পানে চেয়ে বলে–না হয় লজ্জা, না হয় দ্বিধা। একদিন হঠাৎ এ সময় দমকা হাওয়া ছোটে, জঙ্গলের যে-কটা গাছ আজো অতর্কিত অবস্থায় বিরাজমান তাতে আচমকা গোঙানি ধরে। হাওয়া এসে এখানে সালুকাপড়ের প্রান্ত নাড়ে; কেঁপে ওঠা মোমবাতির আলোয় ঝলমল করে ওঠে রূপালি ঝালর। রহীমাও কেঁপে ওঠে, কী একটা মহাভয় তার রক্ত শীতল করে দেয়। মনে হয়, কে যেন কথা কইবে, আকাশের মহা-তমিস্রার বুক থেকে বিচিত্র এক কণ্ঠ সহসা জেগে উঠবে। আবার স্থির হয়ে যায়, মোমবাতির শিখাও নিষ্কম্প, স্থির হয়ে ওঠে। ওপরে আকাশভরা তারা তেমনি নীরব।

কোনদিন রহীমা সারা মানবজাতির জন্যে দোয়া করে। ও-পাড়ার ছুনুর বাপ মরণরোগে যন্ণা পাচ্ছে, তাকে শান্তি দাও। খেতানির মা পক্ষাঘাতে কষ্ট পাচ্ছে– তার ওপর করুণা করো। কারা একপাল ছেলেমেয়ে নিয়ে ভাতে কষ্ট পাচ্ছে তাদের ওপরও করুণা করো, রহমত করো। চার গ্রাম পরে বড় নদী। ক-দিন আগে সে-নদীতে ঝড়ের মুখে ডুবে মারা গেছে ক-টি লোক। তাদের কথা স্মরণ করে বলে, ঘরে স্ত্রী-পুত্র রেখে নৌকা নিয়ে যারা নদীতে যায় তাদের ওপর যেন তোমার রহমত হয়।

## শব্দার্থ ও টীকা

**কলমা** – মূল শব্দ আরবি 'কলমহ'। শব্দ, উক্তি, বাণী, মুসলমানদের ধর্মবিশ্বাস পরিজ্ঞাপক উক্তি-লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্ মুহম্মদ রসুলুল্লাহ - আল্লাহ ভিন্ন আর কোন উপাস্য নাই; মুহম্মদ আল্লাহর প্রেরিত পুরুষ। **ঘাড়গুঁজে** – হাঁটুর ভেতর ঘাড় ঢুকিয়ে বসা। **জ্বলন্ত পেট** – ক্ষুধার্ত পেট। **কলতান করে** – উচ্চস্বরে এক সঙ্গে সুর মিলিয়ে। **আমসিপারা** – আরবি বর্ণমালা এর উচ্চারণ সংবলিত সুরা সংকলন। কুরআন শিক্ষার প্রাথমিক পাঠ। **যত্রতত্র** – যেখানে সেখানে। **ধাড়িধাড়ি ছেলে** – বয়স্ক ছেলে। **ধা করে** – হঠাৎ করে তীব্র গতিতে। **মদ্দ** – বয়স্ক পুরুষ। 'মরদ' শব্দ থেকে এ আরবি শব্দটি এসেছে। **মাথায় ছিট** – মাথা খারাপ। **ঠির ঠির করে** – ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে। **মুখে রা নেই** – নিঃশব্দ, নির্বাক। **ধামড়া** – বয়স্ক। **তারস্বরে** – তীব্র শব্দে। **নির্নিমেষ চোখে** – এক দৃষ্টিতে, চোখের পলক না ফেলে তাকানো। **আর্জি** – আবেদন, অভিযোগ। **মহাতমিস্রা** – ঘোর অন্ধকার।

## পাঠ সংক্ষেপ

মজিদ গ্রামের বৃদ্ধ দুদু মিঞাকে কলেমা না জানার জন্য কদর্য ভাষায় তিরস্কার করে। তার বয়স্ক ছেলের খৎনা দেয়া হয়নি এ জন্য গালমন্দ করে। গ্রামের মাতব্বর ও জোতদার খালেক ব্যাপারীর সঙ্গে ইতোমধ্যে মজিদের বন্ধুত্ব দৃঢ় হয়ে ওঠেছে। খালেক ব্যাপারী মজিদের সব কথায় সায় দেয়। স্থির হয় আছরের নামাজের পর দুদু মিঞার বয়স্ক ছেলের খাৎনা দেয়া হবে। মজিদ সব যোগাড় করে। কিন্তু খাৎনা দেয়ার আগ মুহূর্তে জানাজানি হয়ে যায় যে– বৃদ্ধ দুদু মিঞারও খৎনা হয়নি। খালেক ব্যাপারীর মাথা লজ্জায় নত হয়। কারণ সে এ গ্রামের মাতব্বর। মজিদ দুদু মিঞা ও

তার বয়সী পুত্র দুজনকে এসঙ্গে খৎনা দেয়। গ্রামে এ ঘটনায় তোলপাড় সৃষ্টি হয়। বুড়ো-যুবক-শিশু-নারী সবাই এ মজার দৃশ্য দেখে। রহীমাও দেখে এ দৃশ্য। সবার মুখে চাপা হাসি আর ভয়। মজিদ এ ঘটনার মধ্য দিয়ে গ্রামে তার আসন আরও শক্ত করে নেয়। সে ভাবে খালেক ব্যাপারীর শক্তি আছে ঠিকই। কিন্তু তারও শক্তি আছে। তার শক্তির মূল হল মাজার। রহীমার অবস্থানও আস্তে আস্তে শক্ত হয়। কারণ সে শক্তিধর মজিদের স্ত্রী। তার মাধ্যমেই সবাই মাজারের দোয়া চায়। রহীমার মনও দয়ায় ভরে ওঠে। সে সবার জন্য দোয়া কামনা করে।

## পাঠোত্তর মূল্যায়ন

| | |
|---|---|
| ☞ | নিচের সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্নগুলো পড়ুন ও সম্ভাব্য উত্তর চিন্তা করুন। কিছু প্রশ্নের উত্তর দেয়া আছে- সেগুলো ভাল করে পড়ুন। যে প্রশ্নগুলোর উত্তর দেয়া নেই সেগুলো নিজে নিজে লিখুন। |

**সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্ন**

১. মজিদ দুদু মিঞা ও তার ছেলেকে কীভাবে খৎনা দেয়? এতে গ্রামে কীরকম দৃশ্যের অবতারণা হয়?

২. 'আমার বাপেরও খৎনা হয় নাই– তানারে আগে দেন।' – একথা শুনবার পর মজিদও খালেক ব্যাপারীর কিরূপ প্রতিক্রিয়া হয়েছিল তার বর্ণনা দিন।

৩. 'মাজারটি তার শক্তির মূল।' – কথাটির ইঙ্গিত ব্যাখ্যা করুন।

৪. রহীমার অবস্থান কীভাবে ক্রমে ক্রমে দৃঢ় হয়ে ওঠে?

৫. 'না খেতে পাওয়ার কথাটি শোনানো অভ্যাস তার।' এটা কার অভ্যাস? তার এ কথা শুনে মজিদের কী প্রতিক্রিয়া হয়?

৬. স্বামীর কীর্তিতে রহীমার মুখ উজ্জ্বল হয়ে ওঠে কেন? এ কীর্তিটি কি?

৭. 'কোন কোন দিন রহীমা সারা মানব জাতির জন্য দোয়া করে।' – ঔপন্যাসিকের এ উক্তিতে কী প্রকাশ পেয়েছে?

# ইউনিট ৩

## পাঠ ১

**উদ্দেশ্য**

**এ পাঠটি পড়ে আপনি–**

- হাসুনির মা ও তার বাবা-মায়ের জীবন সম্পর্কে একটি বর্ণনা লিখতে পারবেন।
- হাসুনির মার-বাবাকে ঘিরে মজিদের ভূমিকা ও অবস্থান সম্পর্কে একটি ব্যাখ্যা দিতে পারবেন।

| | |
|---|---|
| ☞ | মূল অংশটি ভালো করে পড়ুন এবং ঘটনা ধারা বুঝতে চেষ্টা করুন। কঠিন, অজানা ও আঞ্চলিক শব্দ ও বাক্যরীতি, বাগধারার অর্থ, ব্যাকরণ ইত্যাদির জন্য শব্দার্থ ও টীকা দেখুন। অন্যান্য পাঠগুলো একইভাবে পড়ুন। |

## মূলপাঠ

অনেক সময় অদ্ভুত আর্জি নিয়ে মেয়েলোকেরা আসে রহীমার কাছে। যেমন আসে ধান-ভাননি হাসুনির মা। বহুদিন আগে নিরাকপড়া এক শ্রাবণের দুপুরে মাছ ধরতে মতিগঞ্জের সড়কের ওপর যারা প্রথম মজিদকে দেখেছিলো, সেই তাহের আর কাদেরের বোন হাসুনির মা। সে এসে বলে,

–আমার এক আর্জি।

এমন এক ভঙ্গিতে বলে যে রহীমার হাসি পায়। কিন্তু মনে মনেই হাসে, গম্ভীর হয়ে থাকে বাইরে। হাসুনির মা বলে,

–আমার আর্জি –ওনারে কইবেন, আমার যেন মওত হয়।

এবার ঈষৎ হেসে রহীমা বলে;

–ক্যান গো বিটি?

–জ্বালা আর সইহ্য হয় না বুবু। আল্লায় যেন আমারে সত্বর দুনিয়া থিকা লইয়া যায়।

সকৌতুকে রহীমা প্রশ্ন করে,

–তোমার হাসুনির কী হইব তুমি মরলে?

সেদিকে তার ভাবনা নেই। আপনা থেকেই যেন উত্তর যোগায় মুখে।

–তুমি নিবা বুবু। তোমারই হাতে সোপর্দ কইরা আমি খালাস হমু। রহীমা হাসে। হাতে কাঁথার কাজ। হাসে আর মাথা নত করে কাঁথা সেলাই করে।

একদিন হাসুনির মা এসে বলে,

–আমার এক আর্জি বুবু।

–কও?

ওনারে কইবেন–বুড়াবুড়ি দুইগারে যানি দুনিয়ার থন লইয়া যায় খোদাতা'লা।

কৃত্রিম বিস্ময়ে চোখ তুলে চেয়ে রহীমা প্রশ্ন করে,

–ওইটা আবার কেমন কথা হইল?

–হ, খাঁটি কথা কইলাম বুবু। দুইটার লাঠালাঠি চুলাচুলি আর ভাল্ লাগে না।

বুড়ো বাপ তার ঢেঙা দীর্ঘ মানুষ; মা ছোটখাটো, কুঁকড়ানো। কিন্তু দুজনের মুখে বিষ; ঝগড়া-ফ্যাসাদ লেগেই আছে। তবে এক-একদিন এমন লাগা লাগে যে, খুনাখুনি হবার জোগাড়। ঢেঙা লোকটি তেড়ে আসে বারবার, ঘুণ-ধরা হাড় কড়কড় করে। বুড়ি ওদিকে নড়েচড়ে না। এক জায়গায় বসে থেকে মাথা ঝাপিয়ে-ঝাপিয়ে রাজ্যের গালাগাল জুড়ে দেয়। গালাগাল দিয়ে বুড়োকে যখন বিন্দুমাত্র ঘায়েল করতে পারে না তখন শেষ অস্ত্র হানে।

—ওরে মরার ব্যাটা, তুই কী ভাবছস? ভাবছস বুঝি পোলাগুলি তোর জন্মের? আল্লা সাক্ষী—হেগুলি তোর জন্মের না, তোর জন্মের না!

শুনে হাসুনির মায়ের কান লাল হয়ে ওঠে, আর আঁচলে মুখ লুকিয়ে হাসে।

তাহের-কাদের আর কনিষ্ঠ ভাই রতন-তাদের বুদ্ধি-বিবেচনা থাকলেও তা আবার স্বার্থের ঘোরে ঢাকা। সামান্য হলেও বাপের জমি আছে, ঘর আছে, লাঙল-গরু আছে। তার দিনও ঘনিয়ে এসেছে— আর বর্ষায় টেকে কিনা সন্দেহ। তারা চুপ করে শোনে।

অন্ধ ক্রোধে কাঁপতে কাঁপতে বুড়ো বাপ এগিয়ে আসে। ছেলেদের পানে চেয়ে বলে,

—হুনছস্ কথা, হুনছস্?

ছেলেরা সমস্বরে বলে,

—ঠ্যাঙা বেটিরে, ঠ্যাঙা।

সমর্থন পেয়ে বুড়ো চেলা নিয়ে দৌঁড়ে আসে। তাহের শেষে জমিজোতের মায়া ছেড়ে বাপের হাত ধরে ফেলে। কাদের বোঝায়,

—থাক, কইবার দেও। খোদাই তার শাস্তি করবো।

জন্মের কথা নিয়ে মায়ের উক্তি শুনে হাসুনির মায়ের কান লাল হয়ে ওঠে, কিন্তু পরে বুকে যন্ণা হয়। তাই রহীমাকে এসে বলে কথাটা।

—হয় বুড়াবুড়ি দুইটাই মরুক—নয় ওনারে কন, এর একটা বিহিত করবার। হঠাৎ সমবেদনায় রহীমার চোখ ছল ছল করে ওঠে। বলে,

—তুমি দুঃখ করিও না বিটি। আমি কমুনে।

মেয়েটাকে তার ভালোই লাগে। দুঃস্থা মেয়ে। স্বামীর মারা যাবার পর থেকে বাপের বাড়িতে আছে। বাড়িতে তিনতিনটে মর্দ ছেলে, বসে-বসে খায়। এক মুঠোর মত যে-জমি, সে-জমিতে ওদের পেট ভরে না। তাই টানাটানি, আধ-পেটা খেয়ে দিন গুজরান। বসে বসে অন্ন ধ্বংস করতে লজ্জা লাগে হাসুনির মায়ের। সে তো একা নয়, তার হাসুনিও আছে। তাই বাড়িতে-বাড়িতে ধান ভানে। কিন্তু কিছু একটা মুখ ফুটে চাইতে আবার লজ্জায় মরে যায়।

রহীমা বলে,

শ্বশুর বাড়িতে যাওনা ক্যান?

—অরা মনুষ্যি না।

—নিকা কর না ক্যান?

কয়েক মুহূর্ত থেমে হাসুনির মা বলে, দিলে চায় না বুবু।

জীবনে তার আর সখ নেই। তবে গাঁয়ের আর মানুষের রক্ত তারও দেহে বয় বলে মাঠ ভরে ধান ফললে অন্তরে তার রঙ ধরে। বতোর দিনে বাড়ির-বাড়ি কাজ করে হাসুনির মায়ের ক্লান্তি নেই। মুখে বরঞ্চ চিকনাই-ই দেখা দেয়। এমনি কোন দিনে তাহের খোশ মেজাজে বলে,

—শরীলে রঙ ধরছে ক্যান, নিকা করবি নাকি?

বুড়ি আমের আঁটির মত মুখটা বাড়িয়ে বলে,

—খানকির বেটির নিকা করবো বলাই তো মানুষটারে খাইছে!

মানুষটা মানে তার মৃত স্বামী। তাহের কৌতুক বোধ করে। বলে, ক্যামনে খাইছস্?

হাসুনির মায়ের অন্তর তখন খুশিতে টলমল। কথা গায়ে মাখে না। হেসে বলে –গিলা খাইছি! মা-বুড়ি আছে সামনে, নইলে গিলে খাওয়ার ভঙ্গিটাও একবার দেখিয়ে দিতো।

দূরে ধানক্ষেতে ঝড় ওঠে, বন্যা আসে পথভোলা অন্ধ হাওয়ায়, দিগন্ত থেকে গড়িয়ে-গড়িয়ে আসে অফুরন্ত ঢেউ। ধানক্ষেতের তাজা রঙে হাসুনির মায়ের মনে পুলক জাগে। আপন মনকেই ঠাট্টা করে বারবার শুধায়; নিকা করবি মাগি, নিকা করবি?

কিন্তু কাকে করে? ওই বাড়ির মানুকে পেলে করে কি? তেল-চকচকে জোয়ান কালো ছেলে। গলা ছেড়ে যখন গান ধরে তখন ধানের ক্ষেতে যেন ঢেউ ওঠে।

পরদিন তাহেরের বুড়ো বাপকে মজিদ ডেকে পাঠায়। এলে বলে, –তোমার বিবি কী কয়?

বুড়ো ইতস্তত করে, ঘাড় চুলকে এধার-ওধার চেয়ে আমতা-আমতা করে। মজিদ ধম্‌কে ওঠে।

–কও না ক্যান?

ধমক খেয়ে ঢোক গিলে বুড়ো বলে,

–তা হুজুর ঘরের কথা আপনারে ক্যাম্‌নে কই?

কতক্ষণ চুপ থেকে মজিদ ভারি গলায় বলে,

–আমি জানি কী কয়। কিন্তু তুমি কেমন মদ্দ, দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া শোন হেই কথা?

দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে শোনে এ-কথা ঠিক নয়। তখন রাগে সে চোখে অন্ধকার দেখে, চেলা কাট নিয়ে ছুটে যায় বুড়িকে শেষ করবার জন্য। এর মধ্যে একদিন হয়তো সে শেষই হয়ে যেতো–যদি না ছেলেরা এসে বাধা দিতো। কিন্তু সে-কথাও বলতে পারে না মজিদের সামনে। কেবল আস্তে বলে,

–বুড়ির দেমাক খারাপ হইছে হুজুর। আপনে যদি দোয়া পানি দ্যান–

আবার কতকক্ষণ নীরব থেকে মজিদ বলে,

–বিবিরে কইয়া দিও, অমন কথা যদি আর কোন দিন কয় তাইলে মছিবৎ হইব।

মাথা নেড়ে বুড়ো চলে যাবার জন্য পা বাড়ায়। কয়েক পা গিয়ে থামে, থেমে মাথা চুলকে বলে,

–হুজুর, কোত্থিকা হুনছেন বেটির কথা?

–তা দিয়া তোমার দরকার কী? কিন্তু এই কথা জাইনো–কোন কথা আমার অজানা থাকে না।

সারাপথ ভাবে বুড়ো। কে বললো কথাটা? বাড়ির গায়ে আর কোন বাড়ি নেই যে, কেউ আড়ি পেতে শুনবে।

এককালে বুড়ো বুদ্ধিমান লোকই ছিলো। সারাজীবন দুষ্ট প্রকৃতির বৈমাত্রেয় এক ভাই-এর সাথে জায়গাজমি-সম্পত্তি নিয়ে মারামারি মামলা মকদ্দমা করে আজ সব দিক দিয়ে সে নিঃস্ব। জায়গাজমির মধ্যে আছে একমুঠো পরিমাণ জমি–যা দিয়ে একজনেরই পেট ভরে না। আর এদিকে পেয়েছে খিটখিটে মেজাজ। সবাইকে দুচোখের বিষ মনে হয়। বুড়িটার হয়তো তার ছোঁয়াচ লেগেই অমন হয়েছে। নইলে বহুদিন আগে যৌবনে কেমন হাসিখুশি ছটফটে মেয়ে ছিলো সে। স্থির থাকতো না এক মুহূর্ত, নাচতো কেবল নাচতো, আর খই-এর মত কথা ফুটতো মুখ দিয়ে আজ তার সুন্দর দেহমন পচে গিয়ে এ হাল হয়েছে।

বুড়ি যে ছেলেদের জন্ম নিয়ে কথাটা বলতে শুরু করেছে তা বেশিদিন নয়। সাধারণ গালাগালি দিয়ে আর স্বাদ হয় না; তাই এমন এক কথা বের করেছে যা বুড়োর আত্মা গিয়ে খচ করে ধরে। কথাটা মিথ্যা জেনেও প্রচণ্ড ক্রোধে জ্বলে ওঠে অন্তরটা।

বুড়ো ভাবে, ছেলেরা বলতে পারে না কথাটা। সে-বিষয়ে সে নিঃসন্দেহ। তবে কী হাসুনির মা বলেছে? তার তো ও বাড়িতে যাতায়াত আছে।

একটা বিষয়ে কিন্তু গোলমাল নেই তার মনে। অন্তরের শক্তিতে মজিদ ব্যাপারটা জানতে পেরেছে সে কথা সে বিশ্বাস করে না।

যত ভাবে কথাটা, তত জ্বলে ওঠে বুড়ো। যে বলেছে সে কি কথাটার গুরুত্ব বোঝে না? কথাটা কী বাইরে ছড়াবার মত? এর বিহিত ঘরেই হয়, বাইরে হয় না—তা যতই আলেম-খোদাবন্দ মানুষ তার বিহিত করতে আসুক না কেন। তাছাড়া, কথাটায় যে বিন্দু মাত্র সত্য নেই কে বলতে পারে। এককালে বুড়ি উড়ুনি মেয়ে ছিলো, তার হাসি আর নাচন দেখে পাগল হতো কত লোক। বৈমাত্রেয় ভাইটির সঙ্গে ঝগড়া-বিবাদের শুরুতে একবার একটা লোক ঘরে ঢোকার জনরব ওঠেছিলো। একদিন তার অনুপস্থিতিতে সে-কান্ডটি নাকি ঘটেছিলো। কিন্তু ঘরের বউ অনেক ঠ্যাঙানি খেয়েও কথাটা যখন স্বীকার করেনি তখন সে বিশ্বাস করে নিয়েছিলো যে, তা দুষ্ট প্রকৃতির বৈমাত্রেয় ভাইটির সৃষ্টি ছাড়া কিছু নয়।

অন্দরে ঢুকেই সামনে দেখলে হাসুনির মাকে। দেখেই চড় চড় করে মেজাজ গরম হয়ে ওঠে, ঘূর্ণি খেয়ে চোখ অন্ধকার হয়ে যায়। বকের মত গলা বাড়িয়ে ছুটে গিয়ে তাকে ধরে এক আছাড়ে মাটিতে ফেলে দেয়। তারপর শুরু হয় প্রহার। প্রহার করতে করতে বুড়োর মুখে ফেনা ছুটে যায়। আর বলে কেবল একটি কথা-ওরে ভাতার খাইকা জারুণি, তোর বাপরে গিয়া কইলি ক্যামনে ওই কথা?

প্রাণের আশ মিটিয়ে বুড়ো তার মেয়েকে মারে। ছেলেরা তখন ঘরে ছিলো না বলে তাকে রক্ষা করবার কেউ ছিলো না। বুড়ি অবশ্য ওধারে পা ছড়িয়ে তীক্ষ্ণ -কণ্ঠে বিলাপ জুড়ে দেয়, কিন্তু বিলাপ শুনে দমবার পাত্র বুড়ো নয়।

সেদিন দুপুরে মুখে আঘাতের চিহ্ন ও সারা দেহে ব্যথা নিয়ে চুপি-চুপি ঘর থেকে বেরিয়ে হাসুনির মা সোজা চলে গেলো মজিদের বাড়ি। মজিদ তখন জিরুচ্ছে, আর, সে-ঘরেই নিচে পাটিতে বসে রহীমা কাঁথায় শেষ কটা ফোঁড় দিচ্ছে।

হাসুনির মা মজিদের সামনে আসে না। কিন্তু আজ সটান ঘরে ঢুকে তার সামনেই রহীমার পাশে বসে মরাকান্না জুড়ে দিলো। প্রথমে কিছু বোঝা গেলো না। কথা স্পষ্টতর হয়ে এলে এটুকু বোঝা গেলো যে, সে রহীমাকে বলেছে; ওনারে কন্, আমার মওতের জন্য যানি দোয়া করে।

মজিদ হুকা টানে আর চেয়ে-চেয়ে দেখে। ক্রন্দনরতা মেয়ে তার ভালোই লাগে। কথায় কথায় ঠোঁট ফুলাবে, লুটিয়ে পড়ে কাঁদবে—এমন একটা বৌ-এর স্বপ্ন দেখতো প্রথম যৌবনে। রহীমার না আছে অভিমান, না আছে চপলতা। অপরাধ না করে থাকলেও মজিদ বলছে বলে যে-কোন কথা নির্বিবাদে মেনে নেয়। অমন মানুষ ভালো লাগে না তার।

পরে সব কথা শুনে মজিদের মুখ কিন্তু হঠাৎ কঠিন হয়ে যায়। বুড়ো গিয়ে তার মেয়েকে মেরেছে। মেরেছে এ জন্য যে, সে এসে তাকে কথাটা বলে দিয়েছে।

অনেকক্ষণ গুম হয়ে থেকে মজিদ গম্ভীর কণ্ঠে রহীমাকে বলে,

—অরে যাইতে কও। আর কও, আমি দেখুম নি।

একটু পরে রহীমা বলে,

—ও যাইবার চায় না। ডরায়।

মজিদ আড়চোখে একবার তাকায় হাসুনির মায়ের দিকে। কান্না থামিয়ে মজিদের দিকে পিঠ দিয়ে বসে আছে, আর ঘোমটা-টানা মাথা নত করে নখ দিয়ে পাটি খুটছে। ওধারে ফেরানো মুখটি দেখবার জন্য এক মুহূর্ত কৌতূহল বোধ করে মজিদ। তারপর তেমনি গাম্ভীর্য কণ্ঠে বলে, —থাক তাইলে এখানে।

## শব্দার্থ ও টীকা

**সোপর্দ** — সপে দেয়া, বুঝিয়ে দেয়া। **খালাস হমু** — মুক্তি পাব। **দুনিয়ার থন** — দুনিয়ার থেকে। **ঢেঙা** — লম্বাটে, লম্বা। **মুখে বিষ** — কদর্য ও অশ্রাব্য ভাষা যা বিষের মতো কটু। **সমস্বরে** — একই সঙ্গে শব্দ করে। **গুজরান** — অতিবাহিত করা, কাটানো। **অন্ন ধ্বংস করা** — খেয়ে দেয়ে শেষ করা। **পুলক যাহা** — আনন্দ হয়। **শুধায়** — জিজ্ঞাসা করে। **আমতা আমতা করে** — কী করবে বুঝতে না পেরে সংকোচ বা ইতস্তত করা। **মদ্দ** — বেটা ছেলে। **দেমাক** — মূল শব্দ আরবি দেমাগ্ বা দিমাগ্। অহংকার, গর্ব, এখানে বিগড়ে গেছে বা বুদ্ধি লুপ্ত হয়েছে এ অর্থে ব্যবহৃত। **আড়ি পেতে শুনবে** — চুপ করে অগোচরে ওৎ পেতে শোনা। **খচ করে ধরে** — মনে কাঁটার মতো বিধে যায়। **খোদাবন্দ** — খোদার বান্দা থেকে শব্দটি এসেছে। খোদারভক্ত। ঘূর্ণি খেয়ে — চক্কর মেরে বা ঘোরান দিয়ে। **আশ মিটিয়ে** — আশা বা সাধ পূরণ করে। **ফুরণ** — ফোড় দেয়া।

## পাঠ সংক্ষেপ

তাহের কাদেরের বোন হাসুনির মা বিধবা। সে মজিদের স্ত্রী রহীমার কাছে এক আবেদন নিয়ে আসে। তার মনে অনেক দুঃখ, অনেক যন্ণা। সে আর বেঁচে থাকতে চায় না। রহীমা তার প্রতি সমবেদনা প্রকাশ করে। আশ্বাস দেয় তার আবেদনের কথা মজিদকে বলবে। হাসুনির মার আবেদন তার বৃদ্ধ বাবা মা সারাক্ষণ গালাগালি ঝগড়া ঝাটি ও মারামারি করে। হাসুনির মার মা ঝগড়াঝাটির এক পর্যায়ে অত্যন্ত কদর্য ভাষায় তার ছেলেপুলের জন্ম নিয়েও কথা তোলে। তখন বৃদ্ধ রাগ সামলাতে না পেরে বুড়িকে পেটাতে আসে। হাসুনির মার ভাই তাহের কাদের বাপকে বাধা দেয় না– কারণ বাপের নামে সামান্য যে জমিটুকু আছে সেটা বাপকে চটিয়ে হাতছাড়া করতে চায় না। এসব কথা রহীমাকে বোঝায় সে। রহীমা তাকে সান্ত্বনা দেয়।

হাসুনির মা বিধবা হওয়ার পর থেকে বাপের বাড়িতেই থাকে এবং খেয়ে না খেয়ে জীবন কাটে। ছোট মেয়ে হাসুনিও আছে। তাকেও খাওয়াতে হয়। রহীমা শ্বশুর বাড়িতে আর যেতে চায় না। ধানের মৌসুমে ধান ভানে গ্রামে। মাঠে ফসল হলে তার ভাল লাগে।

হাসুনির মার কথার সূত্র ধরে মজিদ তার বাপকে ডেকে পাঠায়। মজিদ জিজ্ঞাসা করে তার ঝগড়াঝাটির খবর। বুড়িকে শাসন করার কথা বলে। কিন্তু বুড়ো ভেবে অবাক হয় ঘরের কথা পরে জানল কীভাবে। হাসুনির মা ছাড়া মজিদের বাড়িতে তো কেউ আসে না। রাগে আর দুঃখে তার মাথা ঘোরে। বাড়িতে ফিরে হাসুনির মাকে বেদম পেটায় সে। হাসুনির মা মার খেয়ে ঘরে বসে থাকে না। মজিদের ওখানে ছুটে গিয়ে মরাকান্না জুড়ে দেয়। মজিদ হাসুনির মার কান্না শুনে কিছুটা খুশি হয়। এ ধরনের ক্রন্দনরতা মেয়ে মানুষের চেহারা তার ভাল লাগে। তবু বউকে বলে হাসুনির মার ব্যাপারটা সে দেখবে। আজ যেন চলে যায়।

## পাঠোত্তর মূল্যায়ন

| | |
|---|---|
| ☞ | নিচের সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্নগুলো পড়ুন ও সম্ভাব্য উত্তর চিন্তা করুন। কিছু প্রশ্নের উত্তর দেয়া আছে- সেগুলো ভাল করে পড়ুন। যে প্রশ্নগুলোর উত্তর দেয়া নেই সেগুলো নিজে নিজে লিখুন। |

**সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্ন**

১. হাসুনির মা কে? তার মা-বাবার জীবনযাত্রা কীরূপ?
২. হাসুনির মা মজিদের কাছে কি আর্জি জানায়?
৩. বুড়ো বাপ হাসুনির মাকে মারধর করে কেন?
৪. হাসুনির মার মা-বাবার কলহ থেকে মজিদ নিজের অবস্থান কীভাবে দৃঢ় করে নেয়?

**সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্ন**

১. বুড়াবুড়ি দুইগারে যানি দুনিয়ার থন লইয়া যায় খোদাতালা।' – এটা কার উক্তি? কেন এ উক্তি করেছে সে।
২. তাহের কাদের তাদের মা-বাপের ঝগড়ায় চুপ করে থাকে কেন?
৩. 'ধানক্ষেতের তাজা রঙে হাসুনির মায়ের মনে পুলক জাগে।' – কেন?
৪. 'অরে যাইতে কও। আর কও, আমি দেখুম নি।' কে, কাকে, কোন উদ্দেশ্যে এ কথা বলেছে?

# পাঠ ২

**উদ্দেশ্য**

**এ পাঠটি পড়ে আপনি–**

- তাহেরের বাপ ও তার বৃদ্ধা স্ত্রীর কলহপূর্ণ জীবন সম্পর্কে একটি বর্ণনা লিখতে পারবেন।
- হাসুনির মার অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে তার বৃদ্ধ বাপ-এর বিচার ও মজিদের ভূমিকা সম্পর্কে একটি বিবরণ দিতে পারবেন।
- তাহের বাপের নিরুদ্দেশ হওয়ার কারণ বর্ণনা করতে পারবেন।

## মূলপাঠ

অপরাহ্নে জমায়েত হয়। একা বিচার করতে ভরসা হয় না যেন মজিদের। ঢেঙা বুড়ো লোকটা শয়তানের খাম্বা; অন্তরে তার কুটিলতা, আর অবিশ্বাস।

খালেক ব্যাপারীও এসেছে। মাতব্বর না হলে শাস্তিবিধান হয় না, বিচার চলে না। রায় অবশ্য মজিদই দেয়, কিন্তু সেটা মাতব্বরের মুখ দিয়ে বেরুলে ভালো দেখায়।

একটু তফাতে পাছার ওপর বসে চুপচাপ হয়ে আছে তাহেরের বাপ, মুখটি একদিকে সরানো।

খালেক ব্যাপারী বাজখাঁই গলায় প্রশ্ন করে,

—তোমার বিবি কি বলে?

মুখ না তুলে বুড়ো বলে,

—হেই কথা আপনারা ব্যাক্কই জানেন।

কে একজন গলা উঠিয়ে বলে, কথা ঠিক কইরা কও মিঞা।

বুড়ো ওদিকে একবারে ফিরেও তাকায় না।

খালেক ব্যাপারী আবার প্রশ্ন করে,

—এহন কও, হেই কথা তুমি ঢাকবার চাও ক্যান?

কথাটা যেন বুঝলে না ঠিকমত— এমন একটা ভঙ্গি করে বুড়ো তাকায় সকলের পানে। তারপর বলে,

—এইটা কি কওনের কথা? বুড়িমাগী ঝুটমুট একখান কথা কয়-তা বইলা আমি কী পাড়ায় ঢোল-সোহরত দিমু?

ওর কথা বলার ভঙ্গি ব্যাপারীর মোটেই ভালো লাগে না। মজিদ নীরব হয়ে থাকে, কিন্তু উত্তর শুনে তারও চোখ জ্বলে ধিকিধিকি।

লোকটির উত্তরে কিন্তু ভুল নেই। তাই প্রত্যুত্তরের জন্য সহসা কিছু না পেয়ে খালেক ব্যাপারী ধমকে ওঠে বলে,

—কথা ঠিক কইরা কইবার পারো না?

জমায়েতের মধ্যে কয়েকটা গলা আবার চেঁচিয়ে ওঠে, —কথা ঠিক কইরা কও মিঞা, কথা ঠিক কইরা কও। বৈঠক শান্ত হলে খালেক ব্যাপারী আবার বলে,

—তুমি তোমার মাইয়ারে ঠ্যাঙাইছ ক্যান?

—আমার মাইয়া আমি ঠ্যাঙাইছি! — লম্বামুখ খাড়া করে নির্বিকারভাবে উত্তর দেয় তাহেরের বাপ, যেন ভয় নেই ডর নেই। অবশ্য হাতের দিকে লক্ষ্য করলে দেখা যায়, আঙুলগুলো কাঁপছে। ভেতরে তার ক্রোধের আগুন জ্বলছে—বাইরে যতই ঠাণ্ডা থাকুক না কেন?

ব্যাপারী কী একটা বলতে যাচ্ছিল, এবার হাত নেড়ে মজিদ তাকে থামিয়ে নিজে বলবার জন্য তৈরি হয়। ব্যাপারটা আগে গোড়া থেকে ব্যাপারীকে বুঝিয়ে বলেছিলো সে, এবং ভেবেছিলো তার পক্ষ থেকে খালেক ব্যাপারীই কাজটা ঠিকমত চালিয়ে নেবে। কিন্তু তার প্রশ্নগুলো তেমন জুতসই হচ্ছে না। বলছে আর যেন ঠাস্ করে মুখের ওপর চড় খাচ্ছে।

মজিদ গম্ভীর গলায় বলে, ভাই সকল! বলে থেমে তাকায় সবার পানে। পিঠ সোজা করে বসেছে, কোলের ওপর হাত। আসল কথা শুরু করবার আগে সে এমন একটা আবহাওয়া সৃষ্টি করে যে, মনে হয় সে ছুরা ফাতেহা পড়ে তার বক্তব্য শুরু করবে। কিন্তু আরেকবার 'ভাই সকল' বলে সে কথা শুরু করে। বলে, খোদা-তা'লার কুদরত মানুষের বুঝবার

ক্ষমতা নাই। দোষগুণ সৃষ্ট মানুষ। মানুষের মধ্যে তাই শয়তান আছে, ফেরেস্তাও আছে। তাদের মধ্যে গুণাগার আছে, নেকবন্দ আছে। কুৎসা রটনাটা বড় গর্হিত কাজ। কিন্তু যারা শয়তানের চাতুরী বুঝতে পারে না, যারা তাদের লোভনীয় ফাঁদে ধরা দেয় এবং খোদার ভয়কে দিল থেকে মুছে ফেলে—তারা এসব গর্হিত কাজে নিজেদের লিপ্ত করে। মানুষের রসনা বড় ভয়ানক বস্তু; সে-রসনা বিষাক্ত সাপের রসনার চেয়েও ভয়ঙ্কর হতে পারে। প্রক্ষিপ্ত সে-রসনা তার বিষে পরিবারকে-পরিবার ধ্বংস করে দিতে পারে, নিমেষে আগুন ধরিয়ে দিতে পারে সমগ্র পৃথিবীতে।

ঋজুভঙ্গিতে বসে গম্ভীর কণ্ঠে ঢালাসুরে মজিদ বলে চলে। কথায় তার মধু। স্তব্ধ ঘরে তার কণ্ঠে একটা সুর তোলে, যে-সুরে মোহিত হয়ে পড়ে শ্রোতারা।

একবার মজিদ থামে। শান্ত চোখ; কারো দিকে তাকায় না। দাড়িতে আলগোছে হাত বুলিয়ে তারপর আবার শুরু করে,

—পৃথিবীর মধ্যে যিনি সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি, তাঁর ও তাঁর পরিবারের বিরুদ্ধেও মানুষের সে-রসনা প্রক্ষিপ্ত হয়েছে। পঞ্চম হিজরীতে প্রিয় পয়গম্বর বাণি-এল মুস্তালিখ-এর বিরুদ্ধে লড়াই করে প্রত্যাবর্তন করবার সময় তাঁর ছোট বিবি আয়েশা কী করে দলচ্যুত হয়ে পড়েন। তারপর তিনি পথ হারিয়ে ফেলেন। এক নওজোয়ান সিপাই তাঁকে খুঁজে পায়। পেয়ে তাঁকে সসম্মানে নিজেরই উটে বসিয়ে আর নিজে পায়দল হেঁটে প্রিয় পয়গম্বরের কাছে পৌঁছে দিয়ে যায়। যাদের অন্তরে শয়তানের একচ্ছত্র প্রভুত্ব —যারা তারই চক্রান্তে খোদার রোশনাই থেকে নিজের হৃদয়কে বঞ্চিত করে রাখে, তাদেরই বিষাক্ত রসনা সেদিন কর্মতৎপর হয়ে উঠলো। হজরতের এতো পেয়ারা বিবির নামেও তারা কুৎসা রটাতে লাগলো। বড় ব্যথা পেলেন পয়গম্বর। খোদার কাছে কেঁদে বললেন, এয়া খোদা পরবন্দেগার, নির্দোষ আমার বিবি কেন এত লাঞ্ছনা ভোগ করবে, কেন এ-অকথ্য বদনাম সহ্য করবে? উত্তরে খোদাতা'লা মানবজাতিকে বললেন—

থেমে বিসমিল্লা পড়ে মজিদ ছুরায়ে আন-নূর থেকে খানিকটা কেরাত করে শোনায়। তার গম্ভীর কণ্ঠ হঠাৎ মিহি সুরে ভেঙে পড়ে। স্তব্ধ ঘরে বিচিত্র সুরঝঙ্কার ওঠে। শুনে জমায়েতের অনেকের চোখ ছলছল করে ওঠে।

হঠাৎ এক সময়ে মজিদ কেরাত বন্ধ করে, করে সরাসরি তাহেরের বাপের পানে তাকায়। যে লোকটা এতক্ষণ একটা বিদ্রোহী ভাব নিয়ে কঠিন হয়ে ছিলো, তার চোখ এখন নরম। বসে থাকার মধ্যে উদ্ধত ভাবটাও যেন নেই। চোখচোখি হতে সে চোখ নাবায়।

কয়েক মুহূর্ত তার পানে তাকিয়ে থেকে গলা উঠিয়ে মজিদ বলে যে, খোদা তা'লার ভেদ তাঁরই সৃষ্ট বান্দার পক্ষে বোঝা সম্ভব নয়। মানুষের মধ্যে তিনি বিষময় রসনা দিয়েছেন, মধুময় রসনাও দিয়েছেন। উদ্ধত করেও সৃষ্টি করেছেন তাকে, মাটির মত করেও সৃষ্টি করেছেন। সে যাই হোক, মানুষের কাছে আপন সংসার, আপন বালবাচ্চা দুনিয়ার সব চাইতে প্রিয়। তাদেরই সুখ শান্তির জন্য সে অক্লান্ত পরিশ্রম করে, জীবনের সঙ্গে লড়াই করে। আপন সংসারের ভালাই ছাড়া অন্য কিছু ভাবতে পারে না সে। কিন্তু যে-মেয়েলোক আপন সংসার আপন হাতে ভাঙতে চায় এবং আপন সন্তানের জন্ম সম্পর্কে কুৎসা রটনা করে, সে নিজের বিরুদ্ধে কাজ করে, খোদার বিরুদ্ধে আঙুল ওঠায়। তার গুণাহ্ বড় মস্ত গুণাহ্, তার শাস্তি বড় কঠিন শাস্তি।

হঠাৎ মজিদের গলা ঝনঝন করে ওঠে।

—তুমি কী মনে করো মিঞা? তুমি কী মনে করো তোমার বিবি মিছা বদনাম করে? তুমি কী হলফ কইরা বলতে পারো তোমার দিলে ময়লা নাই?

যে-লোক কিছুক্ষণ আগে খালেক ব্যাপারীর মত লোকের মুখের ওপর ঠাস্-ঠাস্ জবাব দিচ্ছিল, মজিদের প্রশ্নে সে এখন বিভ্রান্ত হয়ে যায়। কোথা দিয়ে কোথায় তাকে আনে মজিদ, সে বোঝে না। মন ঘাটতে গিয়ে দেখে সেখানে সন্দেহ—এতদিন পর আজ সন্দেহ! বহুদিন আগে তার বউ যখন চড়ুই পাখির মত নাচতো, হাসিখুশি উজ্জ্বলতায় চারিদিকে আলো ছড়াতো, তখন যে-জনরব ওঠেছিলো সে-কথাই তার স্মরণ হয়। কোনদিন সে-কথা সে বিশ্বাস করেনি। তখন কথাটা যদি সত্যি বলে প্রমাণিত হতোও, সে তাকে তালাক দিতে পারতো। গলা টিপে খুন করে ফেললেও বেমানান দেখাতো না। কিন্তু আজ এতদিন পরে যদি দেখে সেদিন তারই ভুল হয়েছিলো, তবে সে কী করতে পারে? বউ আজ শুধু কঙ্কাল, , পচনধরা মাংসের রদ্দি খোলস-তাকে নিয়ে সে কী করবে? অন্ধকার ভবিষ্যতের মধ্যে যে-ভীতির সৃষ্টি হবে সে-ভীতি দূর করবে কী করে?

মজিদ গলা চড়িয়ে ধমকের সুরে আবার বলে,

—কী মিঞা? তোমার দিলে কি ময়লা আছে? তুমি কি ঢাকবার চাও কিছু, লুকাইবার চাও কোন কথা?

মজিদ থামলে ঘরময় রুদ্ধনিঃশ্বাসের স্তব্ধতা নামে, এবং সে-স্তব্ধতার মধ্যে তার কেরাতের সুরব্যঞ্জনা আবার যেন আপনা থেকেই ঝঙ্কৃত হয়ে ওঠে। সে-ঝঙ্কার মানুষের কানে লাগে, প্রাণে লাগে।

তাহেরের বাপ এধার-ওধার তাকায়, অস্থির-অস্থির করে। একবার ভাবে বলে, না, তার দিলে কিছুই নাই, তার দিল সাফ। বুড়ি বেটির দেমাক খারাপ হয়েছে, তাকে কষ্ট দেবার জন্যই অমন ঝুটমুট কথা বানিয়ে বলে। কিন্তু কথাটা আসে না মুখ দিয়ে।

অবশেষে অসহায়ের মত তাহেরের বাপ বলে,

—কী কমু? আমার দিলের কথা আমি জানি না। ক্যামনে কমু দিলের কথা?

—কিছু তুমি ঢাকবার চাও, লুকাইবার চাও?

অস্থির হয়ে ওঠা চোখে বুড়ো আবার তাকায় মজিদের পানে। তার মুখ ঝুলে পড়েছে, থই পাচ্ছে না কোথাও।

—তুমি কিছু লুকাইবার চাও, কিছু ছাপাইবার চাও? তুমি তোমার মাইয়ারে তাইলে ঠ্যাঙাইছ ক্যান? তার গায়ে দড়া পড়ছে ক্যান? তার গা নীল-নীল হইছে ক্যান?

সভা নিশ্বাস রুদ্ধ করে রাখে। লোকেরাও বোঝে না ঠিক কোথা দিয়ে কোথায় যাচ্ছে ব্যাপারটা। তবে বিভ্রান্ত বুড়োটির পানে চেয়ে সমবেদনা হয় না। বরঞ্চ তাতে দেখে মনে এখন বিদ্বেষ আর ঘৃণা আসে। ও যেন ঘোর পাপী। পাপের জ্বালায় এখন ছট্‌ফট্ করছে। দোজখের লেলিহান শিখা যেন স্পর্শ করেছে তাকে।

হঠাৎ ঋজু হয়ে বসে মজিদ চোখ বোজে। তারপর সে বিসমিল্লাহ পড়ে আবার কেরাত শুরু করে। মুহূর্তে মিহি মধুর হয়ে ওঠে তার গলা, শান্তির ঝরণার মত বেয়ে-বেয়ে আসে, ঝরে-ঝরে পড়ে অবিশ্রান্ত করুণায়।

তারপর সর্বসমক্ষে ঢেঙা বদমেজাজী বৃদ্ধ লোকটি কাঁদতে শুরু করে। সে কাঁদে, কাঁদে, ব্যাঘাত করে না তার কান্নায়। অবশেষে কান্না থামলে মজিদ শান্ত গলায় বলে,

—তুমি কিংবা তোমার বিবি গুনাহ্ কইরা থাকলে খোদা বিচার করবেন। কিন্তু তুমি তোমার মাইয়ার কাছে মাপ চাইবা, তারে ঘরে নিয়া যত্নে রাখবা। আর মাজারে সিন্নি দিবা পাঁচ পয়সার।

মজিদ নিজে তার মাফ দাবী করে না। কারণ মেয়ের কাছে চাইলে তারই কাছে চাওয়া হবে। নির্দেশ তো তারই। তারই হুকুম তামিল করবে সে।

বুড়ো বাড়ি গিয়ে সটান শুয়ে পড়ে। তারপর চোখ বুজে চুপচাপ ভাবে। মাথাটা যেন খোলাসা হয়ে এসেছে। হঠাৎ তার মনে হয়, সারা গ্রামের জমায়েতের সামনে দাঁড়িয়ে সে নির্লজ্জভাবে সায় দিয়ে এসেছে বুড়ির কথায়। সে কথার সত্যাসত্য সম্পর্কে প্রশ্ন তোলেনি, বরঞ্চ পরিষ্কারভাবে বলে এসেছে সে কথা সত্যিই। এবং লোককে এ-কথাও জানিয়ে এসেছে যে, সে একটা দুর্বল মানুষ, এত বড় একটা অন্যায়ের কথা দোষিণীর আপন মুখ থেকে শুনেও চুপ করে আছে। কারণ তার মেরুদণ্ড নেই। সে-কথা সর্বসমক্ষে কেঁদে বুঝিয়ে দিয়ে এসেছে।

হঠাৎ রক্ত চড়চড় করে ওঠে। ভাবে, ওঠে গিয়ে চেলাকাট দিয়ে এ-মুহূর্তেই বুড়ির আমসিপানা মুখখানা ফাটিয়ে উড়িয়ে দিয়ে আসে। কিন্তু কেমন একটা অবসাদে দেহ চেয়ে থাকে। চুপচাপ শুয়ে কেবল ভাবে। পৌরুষের গর্ব ধুলিস্মাৎ হয়ে আছে যেন।

আর সে ওঠে না। বুড়ি মাঝে মাঝে শান্ত গলায় ছেলেদের প্রশ্ন করে,

—দেখ্‌তো, ব্যাটা কী মরলো নাকি?

ছেলেরা ধমকে ওঠে মায়ের ওপর। বলে, কি যে, কও! মুখে লাগাম নাই তোমার? হতাশ হয়ে বুড়ি বলে,

—তাই ক। আমার কি তেমন কপালডা!

আর মারবে না প্রতিশ্রুতি সত্ত্বেও ভয়ে ভয়ে হাসুনির মা ঘরে ফিরে এসেছিল। ভয় যে, সেখানে যা বলেছে বলেছে, কিন্তু একবার হাতে-নাতে পেলে তাকে ঠিক খুন করে ফেলবে বুড়ো। সে এখন অবাক হয়ে ঘুরঘুর করে। উঁকি মেরে বাপের শায়িত নিশ্চল দেহটি চেয়ে দেখে কখনো-কখনো। কখনো-বা আড়াল থেকে শুষ্ক গলায় প্রশ্ন করে,

—বাপজান, খাইবা না?

বাপ কথা কয় না।

দু-দিন পরে ঝড় ওঠে। আকাশে দুরন্ত হাওয়া আর দলে-ভারি কালো কালো মেঘে লড়াই লাগে; মহব্বতনগরের সর্বোচ্চ তালগাছটি বন্দি পাখির মত আছড়াতে থাকে। হাওয়া মাঠে ঘূর্ণিপাক খেয়ে আসে, তির্যক ভঙ্গিতে বাজপাখির মত শোঁ করে নেবে আসে, কখনো ভোঁতা প্রশস্ততায় হাতির মত ঠেলে এগিয়ে যায়।

ঝড় এলে হাসুনির মা'র হৈ-হৈ করার অভ্যাস। হাসুনি কোথায় গেলো রে, ছাগলটা কোথায় গেলো রে, লাল ঝুঁটিওয়ালা মুরগিটা কোথায় গেলো রে। তীক্ষ্ণ গলায় চেঁচামেচি করে, আথালি-পাথালি ছুটোছুটি করে, আর কী-একটা আদিম উল্লাসে তার দেহ নাচে।

ঝড় আসছে হু-হু করে, কিন্তু হাসুনির মা মুরগিটা খুঁজে পায় না। পেছনে ঝোপঝাড়ে দেখে, বাইরে যায়, ওধারে আমগাছে আশ্রয় নিয়েছে কিনা দেখে, বৃষ্টির ঝাপটায় বুজে আসা চোখে পিট-পিট করে তাকিয়ে কুর-কুর আওয়াজ করে ডাকে, কিন্তু কোথাও তার সন্ধান পায় না। শেষে ভাবে, কী জানি, হয়তো বাপের মাচার তলেই মুরগিটা গিয়ে লুকিয়েছে। পা টিপে-টিপে ঘরে ঢুকে মাচার তলে উঁকি মারতেই তার বাপ হঠাৎ কথা বলে। গলা দুর্বল, শূন্য-শূন্য ঠেকে। বলে,

—আমারে চাইরডা চিড়া আইনা দে।

মেয়ে ছুটে গিয়ে কিছু চিড়াগুড় এনে দেয়।

বাপ গবগব করে খায়। ক্ষিধা রাক্ষসের মত হয়ে ওঠেছে।

চিড়া-কটা গলাধঃকরণ করে, বলে,

—পানি দে।

মেয়ে ছুটে পানি আনে। সর্বাঙ্গ তার ভিজে সপসপ করছে, কিন্তু সেদিকে খেয়াল নেই। অনুতাপ আর মায়া-মমতায় বাপের কাছে সে গলে গেছে। বাপের ব্যথায় তার বুক চিনচিন করে। বুড়ো ঢকঢক করে পানি খায়।

তারপর একটু ভাবে। শেষে বলে,

—আর চাইরডা চিড়া দিবি মা?

মেয়ে আবার ছোটে। চিড়া আনে আরো, সঙ্গে আরেক লোটা পানিও আনে।

দু-দিনের রোজা ভেঙে বুড়ো ধনুকের মত পিঠ বেঁকিয়ে মাচার ওপর অনেক-ক্ষণ বসে-বসে ভাবে, দৃষ্টি কোণের অন্ধকারের মধ্যে নিবদ্ধ।

বাইরে হাওয়া গোঙিয়ে-গোঙিয়ে ওঠে, ঘরের চাল হাওয়া আর বৃষ্টির ঝাপটায় গুমরায়। সিক্ত কাপড়ে দূরে দাঁড়িয়ে মেয়ে নীরব হয়ে থাকে। হঠাৎ কেন তার চোখ ছলছল করে। তবে ঘরের অন্ধকার আর বৃষ্টির পানিতে ভেজা মুখের মধ্যে সে অশ্রু ধরা পড়বার কথা নয়।

অবশেষে বাপ বলে, —মাইয়া, তোর কাছে মাপ চাই। বুড়া মানুষ, মতিগতির আর ঠিক নাই। তোরে না বুইঝা কষ্ট দিছি হে-দিন।

মেয়ে কী বলবে। বোকার মত দাঁড়িয়ে থাকে। তারপর মুরগি খোঁজার অজুহাতে বাইরে ঝড়ের মধ্যে গিয়ে দাঁড়াতেই চোখে আরো পানি আসে, হুহু করে, অর্থহীনভাবে, আর বৃষ্টিতে ধুয়ে যায় সে-পানি।

সেদিন সন্ধ্যায় বুড়ো কোথায় চলে গেলো। কেউ বলতে পারলো না গেলো কোথায়। ছেলেরা অনেক খোঁজে। আশেপাশে গ্রামের লোকদের জিজ্ঞাসাবাদ করে, মতিগঞ্জের সড়ক ধরে তিন ক্রোশ দূরে গঞ্জে গিয়েও অনেক তালাশ করে। কেউ বলে, নদীতে ডুবছে। তাই যদি হয় তবে সন্ধান পাবার জো নেই। খরস্রোতা বিশাল নদী, সে-নদী কোথায় কতদূরে তার দেহ ভাসিয়ে তুলেছে কে জানে।

ঘরে বুড়ি স্তব্ধ হয়ে থাকে। যে তার মৃত্যুর জন্য এত আগ্রহ দেখাতো, সে আর কথা কয় না। হাসুনির মা দূর থেকে মজিদের মিষ্টি-মধুর কোরান তালাওয়াৎ শুনেছে অনেকদিন। সে আল্লার কথা স্মরণ করে বলে,

—আল্লা-আল্লা কও মা।

বুড়ি তখন জেগে ওঠে কয়েকবার শিশুর মত বলে, আল্লা, আল্লা–। মজিদের শিক্ষায় গ্রামবাসীরা এ-কথা ভালোভাবে বুঝেছে, পৃথিবীতে যাই ঘটুক জন্ম-মৃত্যু শোক-দুঃখ–যার অর্থ অনেক সময় খুঁজে পাওয়া ভার হয়ে ওঠে–সব খোদা ভালোর জন্যই করেন। তাঁর সৃষ্টির মর্ম যেমন সাধারণ মানুষের পক্ষে বোঝা দুষ্কর তেমন নিত্যনিয়ত তিনি যা করেন তার গূঢ়তত্ত্ব বোঝাও দুষ্কর। তবে এটা ঠিক, তিনি যা করেন মঙ্গলের জন্যই করেন। ঘটনার রূপ অসহনীয় হতে পারে, কিন্তু অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য শেষপর্যন্ত মানুষের মঙ্গল, তার ভালাই। অতএব যে জিনিস বোঝার জন্য নয়, তার জন্যে কৌতূহল প্রকাশ করা অর্থহীন।

ঠিক সে কারণেই বুড়ো কোথায় পালিয়েছে বা তার মৃতদেহ কোথাও ভেসে ওঠেছে কি না জানবার জন্য কৌতূহল হতে পারে, কিন্তু কেন পালিয়েছে তা নিয়ে বিন্দুমাত্র কৌতূহল হবার কথা নয়। যারা মজিদের শিক্ষার যথার্থ মর্ম উপলব্ধি করতে সক্ষম হয়নি, তাদের মধ্যে অবশ্য প্রশ্নটি যে একেবারে জাগে না এমন নয়। কিন্তু সে প্রশ্ন দ্বিতীয়ার চাঁদের মত ক্ষীণ, ওঠেই ডুবে যায়, ব্যাখ্যাতীত অজানা বিশাল আকাশের মধ্যে থই পায় না। যেখানে জন্ম মৃত্যু ফসল হওয়া না-হওয়া, বা খেতে পাওয়া-না পাওয়া একটা অদৃশ্য শক্তির দ্বারা নিয়ন্তি, সেখানে একটি লোকের নিরুদ্দেশ হবার ঘটনা কতখানি আর কৌতূহল জাগাতে পারে। যা মানুষের স্মরণে জাগ্রত হয়ে থাকে বহুদিন, তা সে-অপরাধের ঘটনা। মজিদের সামনে সেদিন লোকটি কেমন ছটফট করেছিলো, পাপের জ্বালায় কেমন অস্থির-অস্থির করেছিলো–যেন দোজখের আগুনের লেলিহান শিখা তাকে স্পর্শ করেছে। তারপর তার কান্না। শয়তানের শক্তি ধূলিস্মাৎ হয়ে গিয়েছিলো সে-কান্নার মধ্যে।

এ-বিচিত্র দুনিয়ায় যারা আবার আর দশজনের চাইতে বেশি জানে ও বোঝে, বিশাল রহস্যের প্রান্তটুকু অন্তত ধরতে পারে বলে দাবি করে, তাদের কদর প্রচুর। সালুতে ঢাকা মাছের পিঠের মত চিরনীরব মাজারটি একটি দুর্ভেদ্য, দুর্লঙ্ঘনীয় রহস্যে আবৃত। তারই ঘনিষ্ঠতার মধ্যে যে-মানুষ বসবাস করে তার দ্বারাই সম্ভব মহাসত্যকে ভেদ করা, অনাবৃত করা। মজিদের ক্ষুদ্র চোখ দুটি যখন ক্ষুদ্রতর হয়ে ওঠে আর দিগন্তের ধূসরতায় আবছা হয়ে আসে, তখনই তার সামনে সে-সৃষ্টি-রহস্য নিরাবরণ স্পষ্টতায় প্রতিভাত হয়–সে-কথা এরা বোঝে।

হাসুনির মার মনেও প্রশ্ন নেই। মাসগুলো ঘুরে এলে বরঞ্চ বাপের নিরুদ্দেশ হবার মধ্যে একটা অন্তর্নিহিত অর্থ খুঁজে পায়।

–খোদার জিনিস খোদা তুইলা লইয়া গেছে!

তারপর মা'র প্রতি অগ্নিদৃষ্টি হানে। বাপ আমাগো নেকবন্দ মানুষ আছিল।

বুড়ি কিছু বলে না। খেলোয়াড় চলে গেছে, খেলবে কার সাথে। তাই যেন চুপ চাপ থাকে।

প্রথম প্রথম হাসুনির মা মজিদের বাসায় আসতো না। লজ্জা হতো। মার লজ্জা নেই বলে তার লজ্জা। তারপর ক্রমে-ক্রমে আসতে লাগলো। কখনো ক্বচিৎ মজিদের সামনাসামনি হয়ে গেলে মাথায় আধহাত ঘোমটা টেনে আড়ালে গিয়ে দাঁড়াতো, আর বুকটা দূর দূর কাঁপতো ভয়ে। বতোর দিনে এ বাড়িতে যাতায়াত যখন বেড়ে গেলো তখন একদিন উঠানে একেবারে সামনাসামনি হয়ে গেলো। মজিদের হাতে হুকা। হাসুনির মা ফিরে দাঁড়িয়েছে এমন সময়ে মজিদ বলে,

–হুকায় এক ছিলিম তামাক ভইরা দেও গো বিটি।

কয়েক মুহূর্ত ইতস্তত করে ঘুরে দাঁড়িয়ে সে হুকাটা নেয়। বুক কাঁপতে থাকে ধপধপ করে, আর লজ্জায় চোখ বুজে আসতে চায়।

হুকাটা দিতে গিয়ে মজিদ কয়েক মুহূর্ত সেটা ধরে রাখে। তারপর হঠাৎ বলে, আহা!

তার গলা বেদনায় ছলছল করে।

তারপর থেকে সংকোচ আর ভয় কাটে। ক্রমে-ক্রমে সে খোলা মুখে সামনে দিয়ে আসা-যাওয়া শুরু করে। না করে উপায় কী! বতোর দিনে কাজের অন্ত নেই। মানুষতো রহীমা আর সে। ধান এলানো-মাড়ানো, সিদ্ধ করা, ভানা-কত কাজ।

একদিন উঠানে ধান ছড়াতে ছড়াতে হঠাৎ বহুদিন পর হাসুনির মা তার পুরানো আর্জি জানায়। রহীমাকে বলে,

—ওনারে কন, খোদায় যানি আমার মওত দেয়।

হঠাৎ রহীমা রুষ্ট স্বরে বলে,

—অমন কথা কইওনা বিটি, ঘরে বালা আইসে।

পরদিন মজিদ একটা শাড়ি আনিয়ে দেয়। বেগুনি রঙ, কালো পাড়। খুশি হয়ে হাসুনির মা মুখ গম্ভীর করে। বলে,

—আমার শাড়ির দরকার কী বুবু? হাসুনিরে একটা জামা দিলেও পরত খন।

হঠাৎ কী হয়, রহীমা কিছু বলে না। অন্যদিন হলে, কথা না বলুক অন্তত হাসতো। আজ হাসেও না।

## শব্দার্থ ও টীকা

**ঢেঙা** – লম্বাটে, দীর্ঘ। **শয়তানের খাম্বা** – খাম্বা' শব্দটি হিন্দি 'খম্বা' শব্দ থেকে এসেছে। এর অর্থ খুঁটি বা স্তম্ভ। একানে হাসুনির মার বাপ অর্থাৎ তাহেরের বাপকেই মজিদের দৃষ্টিতে শয়তানের খুঁটি বলা হয়েছে। তাহেরের বাপ বুড়ো, তার বৃদ্ধা স্ত্রী সঙ্গে সদাসর্বদা ঝগড়া লেগেই আছে। এদিকে বুড়োর মেয়ে হাসুনির মা এসে মজিদের কাছে বাপের বিরুদ্ধে নালিশ দেয়। তাহেরের বাপ একটু এক বোকা ধরনের লোক, প্রতিবাদী। মজিদের এটা মোটেই পছন্দ হয় না। তাই তার দৃষ্টিতে দীর্ঘ এ লোকটা যেন শয়তানের প্রতিমূর্তি। **বাজখাঁই** – অত্যন্ত গম্ভীর ও কর্কশ আওয়াজ। **ব্যাক্কই** – সকলেই, আঞ্চলিক শব্দ। **ঝুটমুট** – মিথ্যা, মিছামিছি। **ঢোল-সোহরত** – কোন বিষয় ঢোল বাজিয়ে জানিয়ে দেয়া বা প্রচার করা। **ধিকিধিকি** – ধীরে ধীরে, ক্রমগত। **ঠ্যাঙাইছ** – মেরেছ। মূল শব্দটি ঠেঙানো, সেখান তেকে আঞ্চলিক প্রয়োগে ঠ্যাঙাইছ হয়েছে। **কুদরাত** – শক্তি, লীলাখেলা। **নেকবন্দ** – পুণ্যবান। **কুৎসা** – অপরের নামে বদনাম রটানো। **গর্হিত** – নিষিদ্ধ। **রসনা** – জিহ্বা, মুখের কথা। **প্রক্ষিপ্ত** – নিক্ষিপ্ত, বেরিয়ে আসা। **ঋজু ভঙ্গিতে** – সোজাভাবে বসা। **মোহিত** – মুগ্ধ। **রোশনাই** – আলো। **পেয়ারা** – প্রিয়। **পর বদ্দেগার** – প্রকৃত শব্দ পরওয়ার দিগার, ফার্সি এ শব্দের অর্থ দয়াময় আল্লাহ। **উদ্ধত** – অবাধ্য, গোঁয়ার। **খোদাতালার ভেদ** – খোদাতালার সৃষ্টির রহস্য। **ভালাই** – ভাল। **হলফ** – প্রতিজ্ঞা। **দিলে ময়লা নাই** – অন্তরে খারাপ কিছু নাই। **রদ্দি** – শব্দটি আরবি। অর্থ হল নিকৃষ্ট বা অচল। যেমন- রদ্দিমাল। **রুদ্ধ নিঃশ্বাসের স্তব্ধতা** – নিঃশ্বাস বন্ধ বা দম বন্ধ হয়ে যাওয়ার মতো নীরবতা। **এধার ওধার** – এদিক সেদিক। **থই পাচ্ছে না** – মারের দাগ পড়া। **বিভ্রান্ত** – হতবুদ্ধি। **লেলিহান** – দাউ দাউ করে জ্বলা। **সর্বসমক্ষে** – সকলের সামনে। **খোলাসা** – পরিষ্কার। **সায় দিয়ে** – সম্মতি দিয়ে। **রক্ত চড়চড় করে ওঠে** – রাগে উত্তেজিত হয়ে ওঠে। আপসিপানা মুখ – শুকিয়ে যাওয়া মুখ। **তালাশ** – খোঁজ, অনুসন্ধান। **নিত্য নিয়ত** – সদাসর্বদা। **দ্বিতীয়ার চাঁদের মত ক্ষীণ** – দুর্বল ও ক্ষণস্থায়ী বুঝাবার জন্য এ উদাহরণ দেয়া হয়েছে। **অগ্নিদৃষ্টি** – রাগান্বিত চোখে তাকানো। **বালা** – (আরবি শব্দ) আপদ-বিপদ।

## দ্বিরুক্ত বাচক শব্দ

উপন্যাসের এ পাঠে ঔপন্যাসিক অনেকগুলো দ্বিরুক্তিবাচক শব্দ ব্যবহার করেছেন। যেএ-

এধার-ওধার, অস্থির-অস্থির, আথালি-পাথালি, পিট-পিট, কুর কুর (আওয়াজ), টিপে-টিপে, শূন্য-শূন্য, গবগব, সপসপ, চিনচিন, গোঙিয়ে-গোঙিয়ে, ছলছল (চোখ)।

## পাঠসংক্ষেপ

হাসুনির মা বৃদ্ধ বাপের বিরুদ্ধে মজিদের কাছে অভিযোগ জানায় তারই পরিপ্রেক্ষিতে মজিদের দরবারে বিচার বসে। এ বিচার সভায় মজিদের সর্বকর্মের সহায়ক খালেক ব্যাপারীও আসে। মজিদ তাহেরের বাপকে নানা প্রশ্ন করে জানতে চায় তার বৃদ্ধা স্ত্রী তার সম্পর্কে যেসব কথা বলে অর্থাৎ তাদের ছেলেপুলেদের জন্ম সম্পর্কে যেসব সংশয়মূলক ও আপত্তিকর কথা বলে সেগুলো সত্য কীনা। বুড়ো লজ্জায় ও ক্ষোভে বিচার সভায় কিছুই বলে না। শুধু মাথা নিচু করে বসে থাকে। মজিদ জিজ্ঞাসা করে সে কেন তার মেয়ে হাসুনির মাকে মেরেচে। বুড়ো তাহেরের বাপ নিরুত্তর থাকে। মজিদ পরোক্ষভাবে বুড়োর পক্ষ অবলম্বন করে ধর্মের ব্যাখ্যা দেয়। মজিদ বলে মুখ দিয়ে অশালীন কথা রটনা করা

মহাপাপ। মজিদ মহানবী (স)-র প্রিয় স্ত্রী আয়েশা (রাঃ) র বিরুদ্ধে মিথ্যা দুর্নাম প্রচার করারও উদাহরণ টেনে আনে। সে ধর্মের ব্যাখ্যা দিয়ে সুরেলা ভাষায় কুরআনের সুরা পড়ে সবার মন ভিজিয়ে তোলে। তারপর তার অনুকূলে একটা পরিবেশ সৃষ্টি হলে বুড়ো তাহেরের বাপকে সরাসরি প্রশ্ন করে বুড়ির কথা সত্য কি না? বুড়ো এবারও অবাক বিস্ময়ে নিশ্চুপ হয়ে থাকে। কী জবাব দেবে সে ভেবে পায় না। বুড়ির যৌবন বয়সে তাদের সংসার জীবনের প্রথমে তার স্ত্রী সম্পর্কে একটা কথা ওঠেছিল বটে, তবে সেসব কথা সে তখন পাত্তা দেয়নি। এতকাল পর এসব কথা টেনে এনে তাকে অপদস্ত করার কী অর্থ থাকতে পারে? মজিদ নানাভাবে ঘুরে ফিরে তার মুখ থেকে সেসব কদর্য কথা বের করে আনতে চায়। অবশেষে বৃদ্ধ লোকটি অসহায়ের মতো কাঁদতে শুরু করে। মজিদ এবার খুশি হয়। সে বলে ভালো মন্দের বিচার খোদা করবেন। তার করার কিছু নেই। তবে বুড়ো যেন তার মেয়ের কাছে মাফ চায়।

এ ঘটনার পর বুড়ো বাড়ি গিয়ে মনের দুঃখে শুয়ে পড়ে। তার মনে হয় সে তো কোন রূপ প্রতিবাদ জানায় নি। এতে বুড়ির অভিযোগই সত্য প্রমাণিত হয়েছে। এ কষ্টে সে আর ও হতাশ হয়ে পড়ে। রাগে ও অপমানে ছটফট করে। তবুও বুড়ো মেয়ের কাছে ক্ষমা চায় একদিন ঝড়ের সময়। হাসুনির মা অবাক হয় বাপের এ ক্ষমা চাওয়ায়। এ ঝড়ের মধ্যে বুড়ো এসময় নিরুদ্দেশ হয়ে যায়। কেউ আর তার খোঁজ পায় না।

ক্রমে ক্রমে নিরুদ্দেশ হওয়ার কথা সবাই ভুলে যায়। দুনিয়ায় সব কিছু আল্লাহর হুকুমে চলে এবং আল্লাহ যা করেন সব ভালোর জন্যই করেন- এ বিশ্বাসে তারা তাহেরের বাপের এ ঘটনাকে কোন গুরুত্ব দেয় না। হাসুনির মাও বাপের কথা আস্তে আস্তে ভুলে গিয়ে মজিদের সংসারের সঙ্গে আরও ঘনিষ্ট হয়। মজিদ একদিন তার জন্য একটা নীল রঙের কালো পাড়ের শাড়ি কিনে আনে। মজিদের স্ত্রী রহীমা এতে কোন কথা বলে না।

## পাঠোত্তর মূল্যায়ন

| | |
|---|---|
| ☞ | নিচের সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্নগুলো পড়ুন ও সম্ভাব্য উত্তর চিন্তা করুন। কিছু প্রশ্নের উত্তর দেয়া আছে- সেগুলো ভাল করে পড়ুন। যে প্রশ্নগুলোর উত্তর দেয়া নেই সেগুলো নিজে নিজে লিখুন। |

**সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্ন**

১. তাহেরের বাপের বিরুদ্ধে কী অভিযোগের ভিত্তিতে বিচার বসে।
২. 'ভেতরে তার ক্রোধের আগুন জ্বলছে বাইরে যতই ঠাণ্ডা থাকুক না কেন?' কার সম্পর্কে একথা বলা হয়েছে? কেন তার ক্রোধ?
৩. বুড়ো তাহেরের বাপের বিচারের সময় ধর্মের ব্যাখ্যা দিয়ে কোন ঘটনার উদাহরণ দেয়?
৪. তাহেরের বাপের নিরুদ্দেশ হওয়ার কারণ কী?
৫. হাসুনির মা কীভাবে মজিদের সংসারে ঘনিষ্ঠ হয়ে ওঠে?

**নমুনা উত্তর**

**প্রশ্ন : তাহেরের বাপের বিরুদ্ধে কী অভিযোগের ভিত্তিতে বিচার বসে।**

**উত্তর :** তাহের বাপ তার মেয়ে হাসুনির মাকে ভয়ানক রকম মেরেছে। হাসুনির মা মরা কান্না জুড়ে দিয়ে মজিদের কাছে এ প্রহারের বিবরণ জানিয়েছে। মেয়েকে বাপের মারার কারণ হল, হাসুনির মা মজিদকে এমন এক গোপন কথা মজিদকে জানিয়ে দিয়েছে যা হাসুনির মা ছাড়া আর কেউ জানে না। ঝগড়ার এক পর্যায়ে হাসুনির মায়ের মা তার স্বামীকে বলছে, এ ছেলেমেয়েগুলো তার নয়। একথাটি মজিদের কানে কীভাবে পৌঁছিল? নিশ্চয়ই হাসুনির মা বলেছে। সে জন্য বুড়ো মেয়েকে খুব মেরেছে। এ অভিযোগের কারণে তার বিচার বসে।

**প্রশ্ন : বুড়ো তাহেরের বাপের বিচারের সময় ধর্মের ব্যাখ্যা দিয়ে কোন ঘটনার উদাহরণ দেয়?**

**উত্তর :** তাহেরের বাপের বিচার সভায় মজিদ হযরত মুহাম্মদের (স.) স্ত্রী বিবি আয়েশা প্রসঙ্গে যে কুৎসা রটেছিল তা বর্ণনা করে। এক যুদ্ধ শেষে ফেরার সময় হযরতের স্ত্রী আয়েশা দলচ্যুত হয়ে পড়েন। তখন এক নওজোয়ান সেপাই তাঁকে সসম্মানে উটের ওপর বসিয়ে নিজে হেঁটে হেঁটে আসে এবং বিবি আয়েশাকে বাড়িতে পৌঁছে দেয়। বিবি আয়েশা হলেন পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ মানুষ হযরত মুহম্মদ (স.) এর পেয়ারা স্ত্রী। তাঁর বিরুদ্ধেও সেদিন কুৎসা রটনা করা হয়েছিল। হযরত আল্লাহর কাছে কেঁদে কেটে প্রতিকার চাইলে আল্লাহ এক সুরা নাযিল করেন। সেই সুরা থেকে মজিদ কিছু পড়ে শোনায়।

**প্রশ্ন : তাহেরের বাপের নিরুদ্দেশ হওয়ার কারণ কী?**

**উত্তর :** মজিদ তাহেরের বাপকে মেয়ের কাছে মাপ চাইতে নির্দেশ নিল। বিচারসভা এভাবে শেষ হয়ে যায়। এদিকে তাহেরের বাপ বাড়িতে এসে সটান শুয়ে পড়ে, তারপর চোখ বুজে ভাবে। বিচার সভায় সে স্ত্রী কথায় সায় দিয়ে এসেছে। এতে নিজের প্রতি তার ধিক্কার জাগল; ভয়ঙ্কর অপমানও বোধ হল। তার সম্পর্কে বুড়ি যে কুৎসিত ইংগিত করেছে তাতে তার মরমে মরে যেতে ইচ্ছা করল। এ লজ্জায় হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য সে নিরুদ্দেশ হয়ে গেল। অবশ্য যাওয়ার আগে মেয়ের কাছে সে মাফ চেয়ে নিয়েছিল।

## প্রসঙ্গ নির্দেশ করে ব্যাখ্যা লিখুন

| | |
|---|---|
| ☞ | যে ব্যাখ্যাগুলো লিখে দেয়া হয়েছে সেগুলো ভাল করে পড়ুন। বাকিগুলো নিজে নিজে লিখুন। |

১. কুৎসা রটনা বড় গর্হিত কাজ।
২. সে ঝঙ্কার মানুষের কানে লাগে, প্রাণে লাগে।
৩. যে তার মৃত্যুর জন্য এত আগ্রহ দেখাতো, সে আর কথা কয় না।
৪. যে জিনিস বোঝার জন্য নয়, তার জন্যে কৌতূহল প্রকাশ করা অর্থহীন।

**নমুনা উত্তর**

**কুৎসা রটনা বড় গর্হিত কাজ।**

আলোচ্য অংশটুকু সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ 'লালসালু' উপন্যাসের একটি তাৎপর্যপূর্ণ উক্তি। উক্তিটি মজিদের।
হাসুনির মায়ের মা তার স্বামীর উদ্দেশ্যে সে কুৎসিত বক্তব্য দিয়েছে তা চরম কুৎসা। মন্দ মানুষই কুৎসা রটনা করে। ভালো মানুষ কখনো এ কাজ করবে না। অনেক সময় মানুষ শয়তানের ফাঁদে পড়ে অন্যের কুৎসা রটনা করে। এক্ষেত্রে সে সত্য মিথ্যা যাচাই করে না। কুৎসায় অনেক ক্ষতি হয়, মান-মর্যাদার হানি হয়। সে জন্য কুৎসা হল একটি খারাপ কাজ। কুৎসা রটনাকারী বা নিন্দুক সর্বত্র ঘৃণিত। এ লোককে কেউ পছন্দ করে না। এ লোক মানুষের মধ্যে ঘৃণা বিদ্বেষ ছড়ায়। সুতরাং কুৎসা প্রচার বন্ধ করতে হবে।

**যে জিনিস বোঝার জন্য নয়, তার জন্যে কৌতূহল প্রকাশ করা অর্থহীন।**

আলোচ্য অংশটি সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহর 'লালসালু' থেকে নেয়া হয়েছে। আল্লাহর মহিমা ও মর্ম বোঝা যে সকলের পক্ষে সম্ভব নয় সে কথাটি এখানে বলা হয়েছে।
মজিদ গ্রামবাসীদের ভালো শিক্ষা দিয়েছে। তার শিক্ষায় তারা বুঝেছে যে জন্ম মৃত্যু রোগ শোক সবই আল্লাহর ইচ্ছায় হয়। সৃষ্টির মর্ম সাধারণ মানুষের পক্ষে বোঝা বেশ কঠিন। তবে এটি বুঝতে হবে যে আল্লাহ যা কিছু করেন সবই মানুষের ভালোর জন্য করেন। অনেক সময় এমন ঘটনা ঘটে যে অসহনীয় মনে হয়। ঘটনাটি বাস্তবে রূপ নিতই। তাছাড়া এর ফলও ভালো হচ্ছে। সে জন্য আল্লাহর কাজকর্মের ব্যাপারে বান্দার অত কৌতূহলী না হওয়াই ভালো। যে জিনিস বোঝা যায় না, তা নিয়ে কৌতূহল না থাকাই উত্তম।